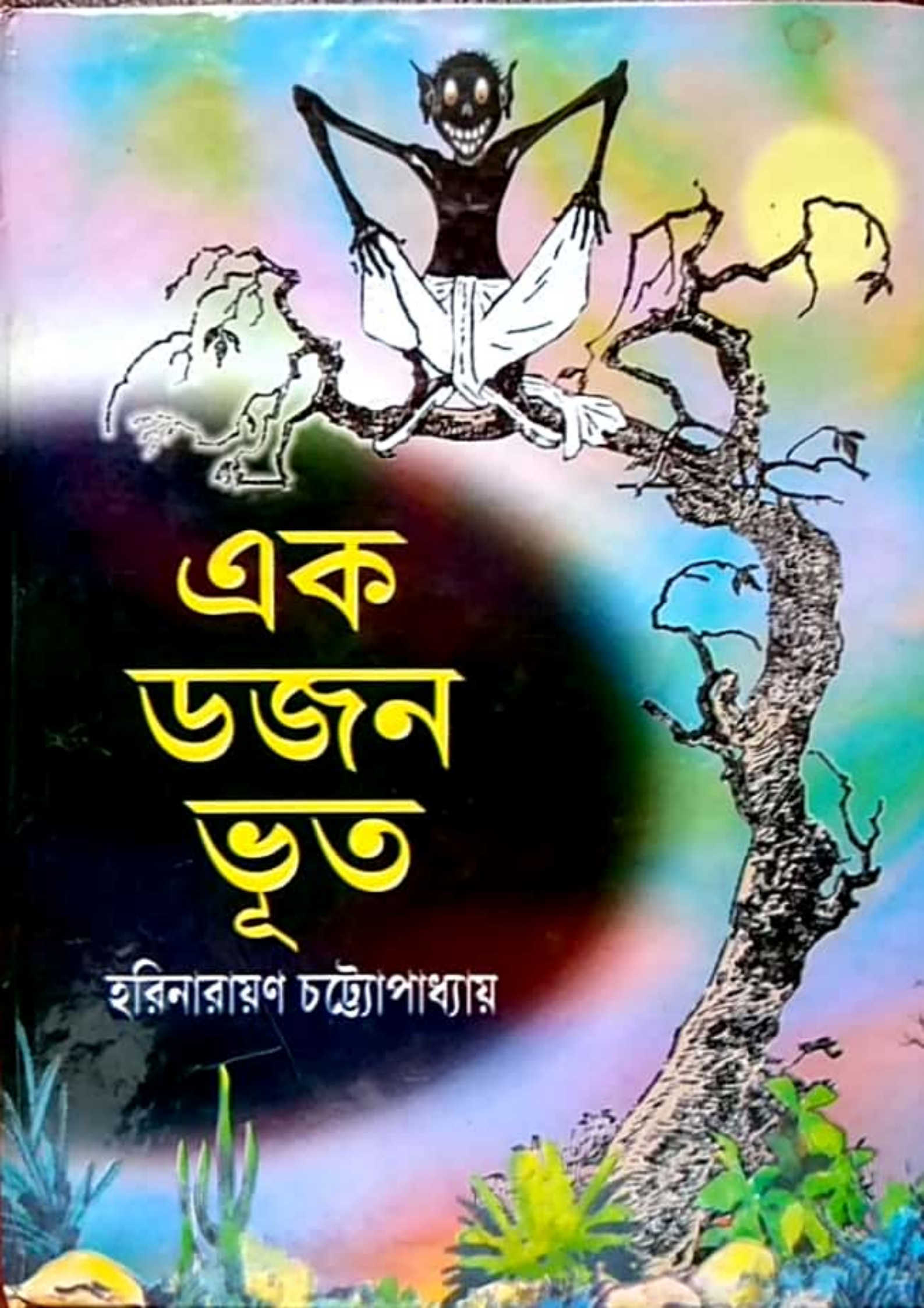

এক ডজন ভূত

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

এক ডজন ভূত

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড
৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
✆ 2241-6497, ✆ 9830260517

প্রথম প্রকাশ ❖ কলকাতা বইমেলা, ২০০৩

দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল - ২০১১

প্রকাশক ❖ স্বপন বসাক
বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড,
৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩

প্রচ্ছদ ❖

অলংকরণ ❖ সুবল সরকার

অক্ষরবিন্যাস ❖ ডি এণ্ড বি ডেটা সার্ভিসেস, কলি-১২

মুদ্রণ ❖ আর ডি এন্টারপ্রাইজেস্, কলকাতা - ৪৮

মূল্য ❖ ৩০.০০

সূচীপত্র

বেনেটির জঙ্গলে ৫

অমর-ধাম ১১

পাঁচ মুণ্ডীর আসর ১৮

আমরা ভূতেরা ২৪

ভূতুড়ে রাত ২৯

রাতের প্রহরী ৩৩

আরণ্যক ৩৯

লাল নিশানা ৪৮

রূপে সে কুরূপা ৬০

বনকুঠির রহস্য ৬৬

মূর্তির কবলে ৭০

গোয়েন্দা ও প্রেতাত্মা ৭৭

বেনেটির জঙ্গলে

অনেক বছর আগের কথা। তখন আমি সরকারের কৃষি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। আমার কাজ ছিল গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চাষ-আবাদের তদারক করা। চাষের ব্যাপারে চাষীদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা দেখা। কোন অঞ্চল থেকে হয়তো খবর এল, ধানগাছ সে রকম বাড়ছে না, কিংবা পাতাগুলো হলদে হয়ে যাচ্ছে নয়তো নারকেল গাছে ফল ধরবার আগেই ঝরে পড়ছে, বেগুনে কালো কালো দাগ হচ্ছে, পোকায় পাট গাছ খতম করে দিচ্ছে, অমনি আমাকে ওষুধবিষুধ নিয়ে ছুটতে হত সে অঞ্চলে। নিজের চোখে সব দেখে ব্যবস্থা করতে হত।

কাজটা আমার খুব ভাল লাগত। যাওয়া আসা দৌড়ঝাঁপে কষ্ট হয়তো একটু হত, কিন্তু বয়স কম থাকার জন্য সে-সব কষ্ট আমার গায়েই লাগত না। সত্যি কথা বলতে কি দিল্লী, আগ্রা, পুরী হরিদ্বারের চেয়ে এই সব গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে আমার ভালই লাগত। এই সব জায়গায় গেলে আমার দেশ আর দেশের মানুষকে ভালভাবে চিনতে পারা যায়।

তাছাড়া আমি গেলে চাষীমহলে একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে যেত। কে আমাকে কি খাওয়াবে তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা। কেউ মুড়ি আনত, কেউ গুড়, কেউ বা আবার খেতের শাকসব্জি, ফলপাকুড়। চলে আসবার সময় সবাই দল বেঁধে আমাকে জীপে তুলে দিত, কিংবা আসত বাসের রাস্তা পর্যন্ত।

এ চাকরিও একদিন ছেড়ে দিলাম। কেন দিলাম সেই কথাটাই তোমাদের বলি।

হঠাৎ আতাপুর থেকে খবর এল, সেখানকার চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে পড়েছে। লাউগাছে ফুল হয়েই শুকিয়ে যাচ্ছে। ফল ধরছে না। আতাপুর লাউয়ের জন্য বিখ্যাত। যেমন আকার, তেমনই স্বাদ। এই লাউ শহরে প্রচুর চালান আসে তানপুরা তৈরীর জন্য।

শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। কদিন আগে জ্বর থেকে উঠেছি। এখনও বেশ দুর্বল। কিন্তু উপায় নেই। আতাপুরের চাষীদের বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। আরও এক অসুবিধা হল। আমাদের তাঁবে তিনটে জীপ। দুটো গেছে নবদ্বীপ আর বীরভূমের দিকে। বাকি যেটা আছে, সেটা অচল। ইঞ্জিন মেরামতের কাজ চলছে।

অগত্যা বাসে যাওয়াই ঠিক করলাম। তার আগে কৃষি বিষয়ের বইগুলো পড়ে নিলাম। কেন অকালে লাউয়ের ফুল ঝরে যাচ্ছে। কিছু ওষুধপত্রও ব্যাগে ভরলাম। অশুভক্ষণেই বোধ হয় যাত্রা শুরু করেছিলাম। মাইল পঁচিশ ছাব্বিশ গিয়েই বাস থেমে গেল। আর এগোবার উপায় নেই।

সামনে কয়াল নদী। অন্য সময়ে এই নদী সরু রুপোলী সুতোর মতন পাশে পড়ে থাকে। ছোট একটা কাঠের পুল। তখন কয়ালের অন্য রকম চেহারা। কি তার গর্জন। এপার ওপার দেখা যায় না। কাঠের পুলের চিহ্ন নেই। নেমে দাঁড়ালাম। এখন উপায়। পাশে একটা টিনের চালা ছিল। চায়ের দোকান। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, গত তিন দিন ধরে এ এলাকায় একটানা বৃষ্টি হয়েছে। মাত্র আজ সকালে থেমেছে। ফলে আশপাশের নদীনালা কূল ছাপিয়ে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। চাষবাস সব নষ্ট। অনেকেই বাড়ি-ঘর ছেড়ে উঁচু জমিতে আশ্রয় নিয়েছে।

সর্বনাশ, এখন কি উপায় হবে। এতটা পথ এসে ফিরেই বা যাই কি করে। চায়ের দোকানের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম।

ভাই, আতাপুরের অবস্থা কি?

লোকটা মাথা চুলকে বলল, আতাপুরের খবর ঠিক জানি না। তবে গাঁটা একটু উঁচু জমির ওপর। বোধ হয় বন্যার জল ঢোকে নি।

আতাপুরে যাব কি করে?

কেন, নৌকা করে বল্লভডাঙ্গা চলে যান। সেখান থেকে পায়ে হাঁটা রাস্তা আছে। রাইচণ্ডী হয়ে আতাপুর, তবে পথে জল পড়বে কিনা জানি না।

ঠিক করলাম বরাত ঠুকে রওনাই হব। আকাশের অবস্থা খুব ভাল নয়। বৃষ্টি থেমেছে বটে, তবে আকাশ জুড়ে কালো মেঘ ঘোরাফেরা করছে। যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে। তার ওপর ফিরে যাবার রাস্তাও বন্ধ। বাস ফেলে রেখে ড্রাইভার আর কণ্ডাকটার সরে পড়েছে। সামনে দেখলাম কয়াল নদীতে গোটা তিনেক নৌকা পারাপার করছে। ব্যাগ কাঁধে ফেলে একটা নৌকায় চেপে বসলাম।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই ওপারে বল্লভডাঙ্গা পৌঁছে গেলাম রাইচণ্ডী পর্যন্ত অনেকেই সঙ্গী হল। তারপর আতাপুরের রাস্তায় আমি একলা। মনে হল এদিকে বন্যার প্রকোপ বেশি নেই, কিন্তু

আতাপুরের কাছাকাছি গিয়েই দেখলাম, দু-পাশে জলের স্রোত। খেতখামার সব জলের তলায়। দু-পাশের বাড়ি খালি। লোকজন সব সরে গেছে। গাঁয়ের মাঝখানে কৃষি বিভাগের বাড়ি। একতলায় অফিস, দু'তলায় থাকার ব্যবস্থা। আমি এলে দু'তলাতেই থাকি। অফিসের সামনে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন অন্ধকার নেমেছে। চারদিকে ব্যাঙ আর তক্ষকের ডাক।

ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে দরজার ওপর আলো ফেললাম। দরজায় বিরাট তালা ঝুলছে।

সর্বনাশ! এখানে রাতটা কাটাব কোথায়? ব্যাগের মধ্যে পাঁউরুটি আর কলা এনেছিলাম, তাও শেষ হয়ে গেছে। আশপাশের বাড়ি বন্ধ। লোকেরা আশ্রয়ের জন্য যে যেখানে পেরেছে, পালিয়েছে। যদিও আতাপুর গ্রামটা উঁচু জায়গায়, তবুও জোর করে কিছু বলা যায় না। বন্যার জল বাড়লেই গ্রামে ঢুকে পড়বে।

নিরুপায় হয়ে এদিক ওদিক দেখলাম। কোথাও কেউ নেই। রাতটা হয়তো অভুক্ত অবস্থায় কৃষি অফিসের বারান্দাতেই কাটাতে হবে। সেটাও মোটে নিরাপদ নয়। কিছুটা এগোতেই নজরে পড়ল পাশের একটা কুঁড়েঘর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। তার মানে লোক আছে ভেতরে।

এগিয়ে গিয়ে বললাম, কে আছ, বাইরে এস।

দীর্ঘ একটা ছায়া। কাছে আসতে লণ্ঠনের আলোয় চিনতে পারলাম। তিলক। কৃষি অফিসের বেয়ারা। সকলের ফাইফরমাস খাটে।

ধড়ে প্রাণ এল। তিলকের কাছে নিশ্চয় অফিসের চাবি আছে। বাইরে রাত কাটাতে হবে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, আমার চিঠি তোমরা পাওনি?

তিলক খনখনে গলায় উত্তর দিল, আর চিঠি? চারদিকে যা ব্যাপার, পিয়নই আসছে না কদিন ধরে। চিঠি বিলি করবে কে?

দাও, অফিসঘরের চাবিটা দাও।

চাবি তো সুনন্দবাবুর কাছে। তিনি চাবি দিয়ে চলে গেছেন।

চলে গেছেন? কোথায়?

তাঁর বাড়ি নন্দীপুর।

নন্দীপুরে সুনন্দবাবুর বাড়ি তা জানতাম। আতাপুর আর নন্দীপুর পাশাপাশি গ্রাম। মাঝখানে আড়াই মাইল।

আড়াই মাইল পথ হয়তো বেশি নয়, কিন্তু দু গ্রামের মধ্যে ঘন জঙ্গল। একপাশে শ্মশান।

দিনের বেলা খুব প্রয়োজন না হলে জঙ্গলে কেউ ঢোকে না। বছর খানেক আগে সুনন্দবাবুর সঙ্গেএকবার তার বাড়ি গিয়েছিলাম। কিন্তু সে দিনের বেলা। তাও দেখেছি ঝুপসি অন্ধকার।

তিলকের কুঁড়ের যা অবস্থা তাতে রাত কাটানোর প্রশ্নই ওঠে না।

একমাত্র উপায় নন্দীপুর চলে যাওয়া। আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো রয়েছে। পথ চলতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

তিলককে তাই বললাম, তাহলে আমি নন্দীপুরেই চলে যাই।

এই রাতে?

এ ছাড়া আর উপায় কি? এখানে থাকব কোথায়? খাব কি?

তা অবশ্য ঠিক। চলে যান রাম নাম করতে করতে।

রাম নাম করতে হবে কেন?

মাঝখানে শ্মশান পড়বে তো। অপদেবতাদের উপদ্রব। তাই বলছি।

ভূতের ভয় আমার কোনকালেই ছিল না। কাজেই সেদিক থেকে অসুবিধা নেই। একমাত্র ভয় ছিল দুর্বৃত্তদের।

কিন্তু দুর্বৃত্তরা আমার কিই বা নেবে? হাতঘড়ি, টর্চ আর সামান্য কিছু টাকা। এসব ভেবে কোন লাভ নেই। নন্দীপুর যাওয়া ছাড়া আমার আর অন্য পথ ছিল না। আড়াই মাইল পথ যেতে বড়জোর আড়াই ঘণ্টা লাগবে। একবার সুনন্দবাবুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পারলে আহার আশ্রয় দুই মিলবে।

ব্যাগটা কাঁধে ফেলে চলতে শুরু করলাম।

পথ যতটা সহজ হবে ভেবেছিলাম ততটা হল না। একেবারে অন্ধকার বন। বট, পাকুড় আর অশ্বত্থের জটলা। গাছ থেকে বিরাট বিরাট সব ঝুরি নেমে জায়গাটা অন্ধকার করে রেখেছে। চাঁদের আলো গাছের পাতায় ঢাকা পড়ে গেল।

টর্চ জ্বাললাম। পায়ে চলা সরু পথ। ভূতপ্রেতের ভয় হয়তো করি না, কিন্তু সাপখোপের উপদ্রব তো আর উপেক্ষা করতে পারি না। সাবধানে এদিক ওদিক দেখে এগোতে লাগলাম।

একমাত্র ভরসার কথা, হাঁটু পর্যন্ত গামবুট ঢাকা। ছোবলে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

এ জঙ্গলের নাম বেনেটির জঙ্গল। কেন এ নাম জানি না। জানবার কোন আগ্রহ হল না। কোন রকমে এটা পার হতে পারলে বাঁচি।

অনেকক্ষণ ঘোরার পর খেয়াল হল। টর্চের আলোয় হাতঘড়িতে দেখলাম তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। যেভাবে হাঁটছি এতক্ষণে নন্দীপুরে পৌঁছে যাবার কথা। তাহলে নিশ্চয় পথ হারিয়েছি।

চলার গতি আরও দ্রুত করলাম। খিদেয় পেট জ্বলছে। শরীরও দুর্বল লাগছে। কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে অন্ধকারে জমাট বাঁধা, জোনাকির মতন কি সব জ্বলছে।

টর্চের আলো ফেলতেই সেগুলো সরে গেল। বুঝতে পারলাম শেয়ালের পাল। টর্চটা এদিক ওদিক ঘোরাতেই দেখলাম চারদিকে মড়ার খুলি আর হাড় ছড়ানো। তার মানে শ্মশান। নন্দীপুর যেতে ডানদিকে শ্মশান পড়ে। শ্মশানের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না। তাহলে নির্ঘাৎ পথ ভুল করেছি।

শ্মশান ডানদিকে রেখে হিসাব করে পথ বদলালাম। কয়েক পা যেতেই ঠক্ করে কপালে একটা গাছের ডাল লাগল।

উঃ করে কপাল চেপে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর টর্চের আলো ওপর দিকে ফেলতেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল।

একটা পা। গাছের ডাল থেকে ঝুলছে।

কেউ বোধ হয় কাউকে মেরে গাছের ডালে টাঙিয়ে রেখেছে। কিন্তু টর্চের আলো যতদূর গেল, কেবল পা'ই দেখতে পেলাম। শরীরটা কোথায় গেল?

কোন রকমে পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়েই বিপত্তি। আবার মাথায় লাগল।

ওপরে চেয়ে দেখি সেই পা।

কি আশ্চর্য, পা'টা এদিকে এল কি করে? যেদিকে যাচ্ছি পা'টাও সেদিকেই ঘুরছে। শরীর ছাড়া পা'ই বা গাছের ডালে কে ঝুলিয়ে রাখল।

মাথা নীচু করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই নাঁকি সুর কানে এল।

অঁ চাটুজ্যে মশাঁই শোঁন, শোঁন, কঁথা আঁছে।

এই এতক্ষণ পরে বুকটা কেঁপে উঠল। কাটা পা দেখে ভেবেছিলাম, কোন বদমায়েশ লোক হয়ত কাউকে কেটে তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে গাছের ডালে টাঙিয়ে রেখেছে। কিন্তু এ ধরনের গলার স্বর গাছের ওপর থেকে আসছে কি করে?

কেউ কি গাছের ডালে বসে ভয় দেখাচ্ছে?

ওপরের দিকে চেয়েই চমকে উঠলাম। টর্চের আলোয় যা দেখলাম, তাতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বিরাট একটা কঙ্কাল। মাথাটা গাছের মগডাল ছাড়িয়ে। কঙ্কালের চোখে সচরাচর যেমন হয়, গর্ত নেই, তার বদলে লাল দুটি সার্চলাইট। আলো দুটো অনবরত ঘুরছে। কাঁধের ওপর ধবধবে একটা পৈতা।

অস্বীকার করব না, লোকে আমাকে খুবই সাহসী বলে জানত। আমি নিজেও ভূতপ্রেতের কাহিনীকে একদম পাত্তা দিতাম না। হেসে উড়িয়ে দিতাম।

কিন্তু সে রাতে বেনেটির জঙ্গলে চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখেছিলাম, তা জীবনে ভুলতে পারব না। সে কথা মনে হলে এখনও মাঝরাতে শিউরে উঠি।

ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে আমি বিদ্যুৎবেগে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম।

কিঁ হঁলরে, ছুঁটছিস কেঁন, কঁথাটা শুঁনে যাঁ।

মনে হয়েছিল গলাটা যেন ক্রমেই কাছে আসছে। প্রত্যেক গাছের ডালে বিরাট আকারের সেই কঙ্কাল-পা। নিশ্চিত মৃত্যু বুঝতে পেরে আমি পাগলের মতন ছুটতে শুরু করেছিলাম। কাঁটাগাছে হাত-পা ক্ষত-বিক্ষত, কতবার যে গাছের শিকড়ে পা আটকে পড়েছিলাম, তার ঠিক নেই।

তবু সেই নাঁকি সুর থেকে রেহাই নেই।

ওঁরে, তুঁইও বাঁমুন, আঁমিও বাঁমুন। তোঁকে কিঁছু কঁরব না। এঁকটু দাঁড়া।

বেনেটির জঙ্গল ছাড়িয়ে যখন সুনন্দবাবুর দরজায় পৌঁছেছিলাম। তখন রাতের অন্ধকার কেটে ভোর হচ্ছে। শরীরে আর এক বিন্দু শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। কোন রকমে একবার দরজার কড়া নেড়েই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

যখন জ্ঞান হয়েছিল, দেখলাম বিছানায় শুয়ে আছি। পাশে সুনন্দবাবু। একটা চেয়ারে ডাক্তার।

চোখ খুলতেই ডাক্তার বলল, আর ভয়ের কিছু নেই। একটু গরম দুধ খাইয়ে দিন। আমার সঙ্গে কাউকে পাঠান, ওষুধ নিয়ে আসবে।

বিকালের দিকে শরীর ঠিক হয়ে গেল। বিছানার ওপর উঠে বসলাম।

সুনন্দবাবু বলল, কি হয়েছে বুঝতে পেরেছি স্যার। বেনেটির জঙ্গলে দুর্লভ চক্রবর্তীর পাল্লায় পড়েছিলেন।

দুর্লভ চক্রবর্তী?

হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ের পুরোহিত। অপঘাতে মরে বেচারি ব্রহ্মদৈত্য হয়ে রয়েছে। বামুন দেখতে পেলেই অনুরোধ করে, গয়ায় পিণ্ড দেবার জন্য।

অপঘাতে মারা গেছে?

হ্যাঁ স্যার শুনুন বলি কাহিনীটা।

সুনন্দবাবু বলতে শুরু করল।

দুর্লভ চক্রবর্তী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আশপাশের গাঁয়ে পুজো, বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশনের কাজ করে যা উপায় করতেন তাতেই তাঁর বেশ চলে যেত। বাড়িতে শুধু বৌ আর একটা ছেলে। কিন্তু ভগবান মানুষকে সব সুখ দেন না। ছেলেটা বিশ্ববখাটে। লেখাপড়া করলই না। বদমায়েশির জন্য স্কুল থেকে নাম কেটে দিয়েছিল। বাপ বুঝিয়েছিলেন আমার সঙ্গে চল বাড়ি বাড়ি পুজোর কাজ শিখবি। ছেলে সে সব কথা কানেও তুলত না।

একদিন অবস্থা চরমে উঠেছিল। দুর্লভ চক্রবর্তীর জ্বর। অথচ গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে নারায়ণ পূজা। জমিদারী আর নেই, কিন্তু জমিদার বাড়ি নামটা আছে। মাসকাবারি বন্দোবস্ত। ভালই দক্ষিণা।

দুর্লভ চক্রবর্তী ছেলের খোঁজ করলেন। ছেলে নেই, ভোরে আড্ডা দিতে বেরিয়েছে। জমিদার বাড়ির লোক এসে চেঁচামেচি করে গেল।

ছেলে ফিরল দুপুরবেলা। দুর্লভ চক্রবর্তী কাঁথা জড়িয়ে দাওয়ায় বসেছিলেন। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে। ছেলেকে যাচ্ছেতাই গালাগাল করলেন। খড়ম ছুঁড়লেন। খড়ম ছেলের গায়ে লাগল না।

ছেলেটিও অকালকুষ্মাণ্ড। উঠানের ওপর একটা বাঁশ পড়েছিল, তাই তুলে নিয়ে সোজা বাপের মাথায়। দুর্লভ চক্রবর্তী ছিটকে পড়েছিলেন। চারিদিকে রক্ত স্রোত। ছেলে নিখোঁজ।

কবিরাজ আসার আগেই সব শেষ। সেই থেকে দুর্লভ চক্রবর্তী বেনেটির জঙ্গলে বটগাছের ডালে বাসা বেঁধেছেন। কারও ক্ষতি করেন না। কেবল বামুন দেখলেই অনুরোধ করে গয়ায় পিণ্ড দেবার জন্য।

অন্য সময় হলে আমি সুনন্দবাবুর কথাগুলো বিশ্বাসই করতাম না, কিন্তু কানে তখনও সেই নাঁকি সুর ভেসে আসছে। অঁ চাঁটুজ্যে মঁশাই, শোঁন, শোঁন। চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পেলাম বীভৎস কঙ্কালমূর্তি। কাঁধে পৈতা, দুটি চোখে আগুনের গোলা।

শহরে ফিরে এসেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলাম।

অমর-ধাম

মাসখানেক ধরে শরীরটা খারাপ হয়েছে। যা খাই, অম্বল হয়। বিকালে মাথার যন্ত্রণা। রাতে ঘুম নেই। কাজে একেবারে উৎসাহ পাচ্ছি না। পাড়ার ডাক্তার বলল, ওষুধে সাময়িক উপকার হতে পারে, স্থায়ী কিছু হবে না। তার চেয়ে বরং ভাল জায়গায় চেঞ্জে চলে যান। মাস দুয়েক থাকলেই সেরে যাবেন।

কোথায় যাব তাই নিয়েই এক সমস্যা। এক এক বন্ধু এক এক রকম উপদেশ দিতে লাগল। কেউ বলল, ভুবনেশ্বর, কেউ হাজারিবাগ, আবার কেউ দেওঘর।

কি করব, কোথায় যাব যখন ভাবছি, তখন হঠাৎ অমলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

অফিস থেকে বেরিয়ে ফাঁকা ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছি, আচমকা পিঠে কার স্পর্শ।

ফিরে দেখি অমল। কলেজ ছাড়ার পর অমলের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

আমাকে দেখে অমল বলল, চেহারা যে বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। কি ব্যাপার?

কি ব্যাপার বললাম।

শুনে অমল বলল, ওসব ভুবনেশ্বর দেওঘরের চিন্তা ছেড়ে দাও। ওখানে কিছু হবে না। তুমি মিলনপুরে চলে যাও। তিনি দিনে তোমার অম্বল সেরে যাবে।

মিলনপুর কোথায়? কখনও তো নাম শুনিনি।

অমল হাসল, বেশি লোক নাম শোনে নি বলেই তো জায়গাটা এখনও ভাল আছে। ভিড় হলেই জলবায়ু বদলে যায়।

যাব কি করে? থাকব কোথায়?

কোন অসুবিধা নেই, আমার বাবা একটা বাংলো কিনেছিল মিলনপুরে। এখন কেউ যাই না। আমিও তো এখন অন্য জায়গায় থাকি, তবে লোক আছে। তার কাছে আমার নাম করো। কোন অসুবিধা হবে না।

অমল আরও বলল, গিরিডি স্টেশনে নেমে বাসে তের মাইল। মিলনপুরে নেমে অমরধাম বললেই যে কোন লোক দেখিয়ে দেবে। তুমি চলে যাও। শরীরটা সারিয়ে এস।

তাই গেলাম।

মিলনপুরে যখন নামলাম, তখন রাত প্রায় আটটা। চারদিক অন্ধকার। একদিকে নীচু নীচু পাহাড়। তার কোলে ঘন অরণ্য। আর একদিকে সরু নদী, প্রায় নালার মতন, কিন্তু কি জলের গর্জন, স্রোত পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলেছে।

টর্চ জ্বেলে কোন রকমে এগোতে লাগলাম। সরু পায়ে চলা পথ। লাল মাটি। মাঝে মাঝে কালো পাথর। অন্যমনস্ক হলে হোঁচট খাবার আশঙ্কা।

পথের একপাশে একটা মুদির দোকান। মুদি ঝাঁপ বন্ধ করছিল আমি গিয়ে দাঁড়ালাম।

এখানে অমরধাম কোথায় বলতে পার?

মুদি লণ্ঠন তুলে কিছুক্ষণ আমার দিকে দেখে বলল, সেখানে তো কেউ থাকে না। বাড়ি একেবারে জঙ্গল হয়ে আছে।

বুঝলাম, মুদি বাড়িটার সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ রাখে না। জঙ্গল হলে কি অমল আমাকে আসতে বলত। এমন হতে পারে মালী হয় তো বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার করে না। তাতেই আগাছা জন্মেছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে। বাড়িটা কোন্ দিকে বল?

মুদি, বলল, সোজা চলে যান। সামনে একটা নীচু টিলা দেখবেন, সেটা বাঁদিকে রেখে ঘুরে যাবেন। এক জায়গায় গোটা চারেক শাল গাছের মেলা। পাশে সাহেবেদের গোরস্থান। সেটা ছাড়িয়ে একটু এগোলেই সাদা পাঁচিল ঘেরা অমরধাম।

এক হাতে সুটকেস, আর এক হাতে টর্চ। সাবধানে এগোতে লাগলাম। রাত ন'টার বেশি হয়নি, কিন্তু এই জনমানবহীন ঘন জঙ্গলে ঘেরা অন্ধকার জায়গায় মনে হচ্ছে যেন নিশুতি রাত। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে, ঝোপে ঝোপে জোনাকির ঝাঁক, মাঝে মাঝে পায়ের কাছে খর খর শব্দ করে কি যেন সরে যাচ্ছে। সাপ হওয়াও বিচিত্র নয়।

এক সময়ে নীচু টিলা পেলাম। গোরস্থানও। অন্ধকারে অনেকগুলো আলোর ফুটকি। সম্ভবতঃ শেয়ালের চোখ। বড় শেয়াল অর্থাৎ বাঘ হওয়াও আশ্চর্য নয়।

যাক, অবশেষে অমরধাম পাওয়া গেল। বেশ ভাল বাংলো। অন্ততঃ এক সময়ে বেশ ভালই ছিল, এখন অযত্নে জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। জলের পাইপে আগাছা

হয়েছে, সামনের চাতাল শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে।

গেট ঠেলতে ক্যাচ করে বিশ্রী একটা শব্দ করে গেট খুলে গেল। ভিতরে গিয়ে জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগলাম। বার দশেক কড়া নাড়ার পর দরজা খোলার শব্দ হল।

বারান্দায় গলা শোনা গেল, কে?

আমি ওপর দিকে মুখ তুলে বললাম, আমি অমরের বন্ধু। আমার আসার কথা ছিল।

আরে পার্থ না? তোমার জন্যই তো অপেক্ষা করে রয়েছি। দাঁড়াও, দরজা খুলে দিচ্ছি।

আমার নিজের খুব অবাক লাগল। কে লোকটা? আমার নাম জানল কি করে? তবে কি আমাদের কোন বন্ধু আমার মতন শরীর সারাতে এখানে এসে উঠেছে।

নীচের দরজা খুলতেই খোলা দরজা দিয়ে এক ঝাঁক চামচিকে উড়ে গেল। আর একটু হলেই তাদের ডানা আমার মাথায় লেগে যেত।

লম্বা চেহারার একটি লোক আমার দু' কাঁধে দু' হাত রেখে বলল, ও পার্থ, কত যুগ পরে দেখা বল তো? টর্চের আলোটা তার দিকে ফেরালাম।

লম্বা পুলক। আমাদের কলেজে দুজন পুলক ছিল, তাই একজন লম্বা পুলক আর একজন বেঁটে পুলক।

তারপরের কথাটা মনে হতেই মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা প্রবাহ নামল। বুকের শব্দ দ্রুততর।

তাই তো শুনেছিলাম, বছর পাঁচেক আগে টালা ব্রিজের কাছে লম্বা পুলক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। পুলক মোটর সাইকেলে ছিল, সামনা সামনি এক লরীর সঙ্গে ধাক্কা, পুলক আর তার মোটর সাইকেল দুইই একেবারে ছাতু হয়েছিল।

কি, সারারাত বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?

পুলক তাড়া দিল।

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, না, চল। একটা কথা ভাবছিলাম।

কি কথা?

শুনেছিলাম দুর্ঘটনায় তুমি মারা গেছ। বছর পাঁচেক আগে।

পুলক খুব জোরে হেসে উঠল।

আরে এক রকম মরাই তো। দেখ না, বাঁ পায়ে একদম জোর পাই না। হাসপাতাল থেকে সোজা এখানে চলে এসেছি। বলতে নেই, এখন বেশ ভাল আছি ভাই, এখানকার জল হাওয়ায় খুব উপকার পেয়েছি। এস, ভিতরে এস।

শরীর খুব পরিশ্রান্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে আমারও ভাল লাগছিল না। কোন রকমে কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচি।

স্নান করবে তো? পুলক জিজ্ঞাসা করল।

এত রাতে? নতুন জায়গায়? সাহস হচ্ছে না।

আরে গরম জলে স্নান করে নাও। শরীর ঝরঝরে লাগবে। গরম জল এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

স্নান সেরে বাইরে আসতে দেখি টেবিল সাজিয়ে পুলক বসে আছে। প্লেট ভর্তি গরম ভাত আর মুরগির মাংস।

এখানে রান্না করে কে?

পুলক বলল, রান্না বাসনমাজা, ঘরদোর পরিষ্কার সবই মুংলা করে। এদেশী লোক। ভারি কাজের।

তুমি খাবে না?

আমি সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে খেয়ে নিই। নাও, তুমি আর বসে থেক না। নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। শুয়ে পড়। ওটা তোমার ঘর।

এ ঘরে ঢুকেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সিঙ্গল খাটের ওপর পরিপাটি বিছানা। মাথার কাছে টিপয়ের ওপর জলের গ্লাস। ভোরে উঠে আমার যে জল খাওয়ার অভ্যাস, এটা পুলক জানল কি করে?

শুয়ে পড়লাম। বিছানায় গা ঠেকানো মাত্র গভীর নিদ্রা।

মাঝরাতে পেঁচার বিদকুটে ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। মাথার কাছে খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো বিছানার ওপর এসে পড়েছে। ঘরের সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

পাশ ফিরে শুতে গিয়েই চমকে উঠলাম। বরফের মতন ঠাণ্ডা স্পর্শ। চোখ খুলেই রক্ত হিম হয়ে গেল।

আমারই বালিশে মাথা দিয়ে একটা কঙ্কাল শুয়ে। একটা হাত প্রসারিত। সেই হাতটাই আমার শরীরে ঠেকেছিল।

আর্তনাদ করে উঠে বসলাম।

কি, কি হল পার্থ?

পুলক খাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কঙ্কালের দিকে আঙুল দেখাতে গিয়েই দেখলাম, বিছানা খালি। কোথাও কিছু নেই।

না, তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। সর, আমি না হয় তোমার পাশে শুই। লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়লাম, না, না, তোমার শুতে হবে না। তুমি যাও।

পুলক সরে গেল। ঘুমোবার চেষ্টা করতে করতে নতুন এক চিন্তা মনে এল। শোবার আগে আমি তো দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, তা হলে পুলক ঘরের মধ্যে ঢুকল কি করে। উঠে আর পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হল না। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে এল।

পরের দিন সকালে উঠেই দেখলাম ঘরের দরজা ভিতর থেকে খিল দেওয়া। এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখলাম ভিতরে ঢোকার আর কোন পথ নেই।

তাহলে পুলক কাল রাতে ঘরের মধ্যে ঢুকল কি করে?

দরজা খুলতেই পুলককে দেখলাম। বাগানে দাঁড়িয়ে আছে।

কাল রাতে তার ঘরে ঢোকার কথা বলতেই সে হেসে উঠল খুব জোরে।

তুমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছ। আমি আবার কখন তোমার ঘরে ঢুকলাম?

স্বপ্ন? তা হবে! কিন্তু এত পরিষ্কার স্বপ্ন জীবনে কখনও দেখিনি। এখন চোখের সামনে যেন ঘুমন্ত নরকঙ্কালটা দেখতে পাচ্ছি।

মুখ হাত ধুয়ে নাও। মুংলা এখনই চা দিয়ে যাবে।

বারান্দায় দুটো বেতের চেয়ার পাতা। মাঝখানে গোল বেতের টেবিল।

হাতমুখ ধুয়ে একটা চেয়ারে বসলাম। উল্টোদিকের চেয়ারে পুলক বসে বলল, মুংলা, পার্থবাবুর চা নিয়ে এস।

চা আর টোস্ট নিয়ে যে এল, তাকে দেখে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল। এমন বীভৎস চেহারা আমি জীবনে দেখিনি।

গায়ে চিমটি কাটলেও এক তিল মাংস উঠবে না, এমনই শীর্ণ চেহারা। চোখ দুটো এত ভিতরে ঢোকা যে আছে কিনা বোঝাই যায় না। সর কাঠির মতন হাত পা। ঝকঝকে দাঁতের পাটি সর্বদাই বাইরে।

চা টোস্ট দিয়ে চলে যেতে আমি বললাম, লোকটার চেহারা দেখলে ভয় করে।

পুলক বলল, মানুষের চেহারা আর কতটুকু? ছাল ছাড়ালে সবাই সমান। মুংলার চেহারা যেমনই হোক, লোকটা কিন্তু খুব কাজের। তাছাড়া নিজের লোক ছাড়া আমরা তো আর যাকে তাকে রাখতে পারি না।

নিজের লোক মানে?

মানে, খুব জানাশোনা। একেও এখানকার গাঁ থেকে অমলই যোগাড় করে এনেছে। খেতে খেতে বললাম, তোমার চা টোস্ট কই?

পুলক উত্তর দিল, আমি এসব খাই না ভাই। সহ্য হয় না। ভোরে উঠে ছোলা ভিজানো খাই আদা দিয়ে।

একটু থেমে পুলক বলল, তুমি বস। আমি একটু ঘুরে আসি।

এখন আবার কোথায় যাবে?

একবার পোস্ট অফিসে যাব, তাছাড়া আরও দু এক-জায়গায় ঘুরে আসব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর না। আমি বাইরে কোথাও খেয়ে নেব।

সারাটা দিন পুলক ফিরল না। সন্ধ্যার সময়েও না।

মুংলাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, বাবুর ফেরার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কোথায় কোথায় যে যান—

খাবার সময়ে এক কাণ্ড। বসে খাচ্ছি, পাশে মুংলা দাঁড়িয়ে। তাকে বললাম, একটু তরকারি নিয়ে এস তো, আর দু'খানা রুটি।

মুংলা চৌকাঠের কাছ পর্যন্ত গিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে তরকারি আর রুটি এনে দিল। ঠিক মনে হল এগুলো নিয়ে কে যেন বাইরে অপেক্ষা করছিল।

কিছু আর জিজ্ঞাসা করলাম না, কিন্তু এ বাড়ির বাতাসে কেমন যেন ভয়ের গন্ধ। মনে হয়

অশরীরী আত্মারা আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে।

সেই রাত্রেই দারুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। পুলক তখনও ফেরেনি।

ঘুম আসেনি, বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছি। হঠাৎ বাইরে খরখর আওয়াজ। পাশা দু-হাতে রগড়ালে যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমনই।

আস্তে আস্তে উঠে জানলার খড়খড়ি খুলে বাইরে চোখ রাখলাম। ম্লান চাঁদের আলো। খুব স্পষ্ট নয়, আবার একেবারে অস্পষ্টও নয়।

উঠানে একটা গুঁড়ির ওপর দুটো কঙ্কাল ঘেঁষাঘেঁষি বসে। একজনের হাত আরেক জনের গলায়। আর একটু দূরে একটা গাছের ডাল ধরে মুংলা দোল খাচ্ছে। কি লম্বা চেহারা! সারা দেহে কোথাও এক তিল মাংস নেই। চোখের দুটো গর্ত থেকে গাঢ় লাল রং বের হচ্ছে।

অজান্তেই মুখ থেকে একটা আর্তনাদ বের হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কাল দুটো ফিরে দেখল। চোখ নেই, তবুও কি মর্মভেদী দৃষ্টি। বুকের রক্ত শুকিয়ে জমাট হয়ে গেল।

আশ্চর্য কাণ্ড! একটু একটু করে কঙ্কাল দুটোয় মাংস লাগল। সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যে দুটি পূর্ণ মানুষের মূর্তি ফুটে উঠল।

তখন আর চিনতে অসুবিধা হল না। একজন পুলক, আর একজন অমল।

কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় ফিরে গেলাম।

সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। যা দেখেছি তারপর ঘুমানো সম্ভবও নয়। বাইরে খটখট শব্দ। মনে হল একাধিক কঙ্কাল মূর্তি উঠানে পায়চারি করছে। সেই শব্দের সঙ্গে পেঁচার ডাক, বাদুড়ের ডানার ঝট্‌পটানি মিশে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করল।

ভোর হতে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করিনি। সুটকেসটা হাতে নিয়ে ছুটতে লাগলাম। বের হবার সময় রান্নাঘর থেকে বাসনপত্রের আওয়াজ আসছিল। একটু পরেই হয় তো মুংলা চা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে। দিনের আলোতেই মুংলার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আমার নেই।

ছুটতে ছুটতে যখন মুদির দোকানের সামনে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন মুদি সবে দোকানের ঝাঁপ খুলছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, এক গ্লাস জল।

মুদি আমাকে দেখে অবাক। বোধ হয় জীবন্ত দেখবে আশাও করেনি। জল দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি অমরধাম থেকে আসছেন?

হ্যাঁ।

খাওয়াদাওয়ার কি করতেন?

মুদির কাছে কিছু বলতে ইচ্ছা হল না। শুধু বললাম, কেন, মুংলা রাঁধত। মুদির মুখটা হাঁ হয়ে গেল। দুটো চোখ বিস্ফারিত।

কাঁপা গলায় বলল, মুংলা মানে মুংলা মুণ্ডা? মুংলাকে তো বছর পাঁচেক আগে অমরধাম-এর এক গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

আত্মহত্যা?

কি জানি, অনেকে বলেছিল, বিষয়সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল হওয়ায় ভাইপোরাই নাকি মেরে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

আর দাঁড়াইনি। গিরিডি না পৌছানো পর্যন্ত শান্তি নেই। অমরধামের বাসিন্দারা গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হলেই সর্বনাশ

বাকীটা শুনলাম গিরিডির স্টেশন মাস্টারের কাছে। ওই বাড়ির অমলবাবু মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করতেন। বছর দুয়েক আগে তাঁকে ঘাড় মটকানো অবস্থায় বাড়ির উঠানে পাওয়া গিয়েছিল। গিরিডি থেকে পুলিসের কর্তা গিয়েছিল, কিন্তু খুনের কোন হদিস হয়নি।

মাথাটা ঘুরে উঠল। তাহলে কলকাতায় রাস্তায় অমলের সঙ্গে দেখা, আমাকে মিলনপুরে আসার আমন্ত্রণ করা, এ সবের কি ব্যাখ্যা হতে পারে?

আর পুলকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু, এ তো আমার জানাই ছিল। নিজেদের দল বাড়াবার জন্যই কি আমাকে ডেকে আনা হয়েছিল? তাহলে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিল যে!

গলায় পৈতা আছে বলেই কি?

কি জানি, যত ভাবি এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাই না।

পাঁচ মুণ্ডীর আসর

স্টেশনের নাম লোচনপুর। সেখান থেকে আরো দু'ক্রোশ। যানবাহন বলতে কিছু নেই। গরমে আর শীতে গরুর গাড়ি চলে, কিন্তু বর্ষায় তা সম্ভব নয়। মাঝপথে দু'দুটো খাল। অন্য সময়ে বালির স্তূপ, বর্ষাকালে পার হওয়া দায়। খেয়া-নৌকা ছাড়া।

উপায় নেই। কোর্টের কাজ। এই চার মাইল পথ পায়ে হেঁটে গিয়ে পুবাই গাঁয়ের সর্বেশ্বর জানাকে ধরতে হবে। ধরা মানে, কোর্টের ভাষায়, সমন ধরিয়ে দেওয়া। এই কাজ না করতে পারলে চাকরি থাকবে না।

হয়তো গিয়ে দেখব, আগে থাকতে খবর পেয়ে সর্বেশ্বর ডুব মেরেছে। কোথাও পাওয়া যাবে না তাকে। তা যদি হয়, তাহলে তার বাড়ির দরজায় নোটিস সেঁটে দিয়ে আসতে হবে। মোট কথা যেতে আমাকে হবেই।

যাত্রা শুরু করলাম। কাঁচা মাটির পথ কিছুটা গিয়েই শেষ হয়ে গেল। তারপর আল। হাতখানেক চওড়া। সার্কাসের খেলার সরু তারের ওপর দিয়ে যেভাবে লোকটা হাঁটে, সেইরকম কায়দায় সাবধানে এগিয়ে চলেছি। একটু এদিক ওদিক হলেই একেবারে কাদাগোলা জলে নাকানি-চোবানি খেতে হবে।

একমাত্র ভরসার কথা, এখনও যথেষ্ট আলো রয়েছে। চারদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হাতের

লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে চলতে লাগলাম।

যা শুনেছিলাম, তা ভুল। খাল দুটো নয়, একটা। খেয়া-নৌকার ব্যবস্থা নেই। সরু খালের ওপর বাঁশের একটা সেতু রয়েছে। দু'হাতে বাঁশ আঁকড়ে খাল পার হলাম।

তারপর আল নয়, সরু পথ। পায়ে চলা। দু'পাশে ঘোড়া নিম আর আশশ্যাওড়ার গাছ। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। মাইলখানেক পথ পার হয়ে পুবাই গাঁয়ে এসে হাজির হলাম। ছোট্ট গ্রাম। একটা দোকান আর গোটা দশেক চালাঘর এই গ্রামের সীমানা।

বরাত ভালই বলতে হবে। সর্বেশ্বরকে একেবারে বাড়ির দাওয়াতেই পেয়ে গেলাম। বসে বসে গাবের আটা দিয়ে জাল মাজছিল। তার কাছে খোঁজ করতেই বাজখাঁই আওয়াজে বলল,

আমি সর্বেশ্বর জানা। পিতা ঈশ্বর পতিত পাবন জানা। মশাইয়ের প্রয়োজন?

প্রয়োজনটা দেখেই সর্বেশ্বর চমকে উঠল। এমন জানলে হয়তো জাঁক করে পরিচয়ই দিত না।

কাজ শেষ করে কোঁচার খুঁটে গাল, কপাল মুছে নিয়ে বললাম, একটু জল খাওয়াতে পারেন?

সর্বেশ্বর একদৃষ্টে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। সে দৃষ্টিতে যেন আগুন ঝরছে।

তারপর বলল, লোচনপুর থেকে আসবার সময় একটা খাল পার হয়ে এসেছেন না?

ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

অনেক জল পাবেন সেই খালে। পেট ভরে চুমুক্ দিতে পারেন।

অবস্থা দেখে আমি আর দাঁড়ালাম না। দাঁড়াতে সাহস হলো না। কিছু বলা যায় না, দলবল ডেকে যদি লাঠির ঘায়ে এখানে খতম করে দেয় তাহলে কিছু করতে পারব না। তারপর মাটি খুঁড়ে লাশটা যদি পুঁতে ফেলে, তাহলেও কাক চিলে জানতে পারবে না।

কোর্টের পেয়াদার ভাগ্যে মারধোর হামেশাই হয়। লোকজন খেপে উঠে আধমরা করে দেয়। একবার ভাবে না, আমরা নিমিত্ত মাত্র। শুধু নির্দেশ জারি করেই খালাস। বুঝতে পারলাম, এ গাঁয়ে ঠাঁই হবে না। ভেবেছিলাম রাতটা কোথাও বিশ্রাম করে ভোর-ভোর রওনা হব, কিন্তু তা হবার নয়।

একেবারে গাঁয়ের মুখে যে দোকানটা দেখেছিলাম, সেখানে এসে দাঁড়ালাম। খাওয়ার জিনিস কিছু পাওয়া যাবে?

দোকানী নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল।

কি চাই বলুন না কত্তা?

চেয়ে দেখলাম, দুটো ধামা পাশাপাশি সাজানো। গোটা কয়েক জার আছে, তবে সব কটাই খালি।

দোকানীই আবার বলল, মুড়ি আছে, পাটালি আছে।

আর কিছু? দুধ কিংবা কলা?

আজ্ঞে না, ওসব এখানে পাবেন না।

নিরুপায়। মুড়ি আর পাটালি নিয়েই কাঠের বেঞ্চের ওপর বসে পড়লাম। দু' এক গাল মুখে দিয়েই বুঝতে পারলাম, মুড়িগুলো অন্ততঃ এক সপ্তাহের বাসি আর পাটালি যে এত তেতো হয়

কি করে, অনেক ভেবেও কুলকিনারা পেলাম না।

খাওয়া শেষ করে, জল খেয়ে পয়সা দেবার মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে রাতটা কাটাবার জায়গা হবে? এ দোকানঘরের একপাশে হাত-পা মুড়ে পড়ে থাকব।

কোন উত্তর নেই দেখে মুখটা তুলেই শঙ্কিত হলাম। দোকানী একদৃষ্টে আমার বুকের ওপর আটকানো পেতলের চাকতির দিকে দেখছে। যেটার ওপর কোর্টের নাম খোদাই করা।

তাড়াতাড়ি পয়সা ক'টা দোকানী হাত থেকে যেন কেড়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, না, মশাই, থাকার জায়গা-টায়গা হবে না। ছেলেপুলে পরিবার নিয়ে থাকি, এখানে আপনি শোবেন কোথায়?

সন্ধ্যা হয়ে এল, তাহলে এখন যাই কোথায়?

এইবেলা স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে পড়ুন। কতটা আর পথ। কলকাতা যাবার শেষ গাড়ি দশটা বত্রিশে। সেটা অনায়াসেই পেয়ে যাবেন।

আমাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করতে শুরু করল। যাতে দোকানের সামনে থেকে অন্ততঃ সরে যেতে বাধ্য হই।

বুঝতে পারলাম, এ গাঁয়ে আশ্রয়ের কোন আশা নেই। বুকের চাকতিটাই আমার কাল। কোর্টের পেয়াদাকে এরা সমনের শামিল বলে মনে করে।

ঠিক করলাম, স্টেশনেই চলে যাব। সত্যিই তো, কতটা আর পথ। যেতে দু'ঘণ্টা কিংবা তিন ঘণ্টা লাগলেও হাতে অনেক সময় থাকবে।

লাঠিটা বাগিয়ে নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। চাকতিটা খুলে নিয়ে পকেটের মধ্যে রেখে দিলাম। চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। গাছপালার জন্য আরো ঝুপ্‌সি ঠেকছে। যাবার সময় যে পথ মসৃণ, সরল মনে হয়েছিল, আধো অন্ধকারে সে পথেই বার বার হোঁচট খেতে লাগলাম।

একটু পরে অন্ধকার ঘন হলো। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ। চাঁদের দেখা নেই। তারাও নেই। ঝোপের ফাঁক থেকে শিয়াল ডেকে উঠলো। হুক্কা হুয়া। হুয়া, হুয়া, হুয়া।

শক্ত হাতে লাঠিটা ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। শিয়ালকে ভয় নেই। শিয়াল জ্যান্ত মানুষের কাছে ঘেঁষে না। কিন্তু জঙ্গলে আর কোন জন্তু নেই তো? হিংস্র কোন জানোয়ার?

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর খেয়াল হলো এতক্ষণে খালের পারে পৌছনো উচিত ছিল। বাঁশের সেতুর কাছ বরাবর। দুটো হাত আড়াআড়িভাবে চোখের ওপর রেখে চারদিক নিরীক্ষণ করে দেখলাম। এখনও অন্ধকার সূচিভেদ্য হয়ে ওঠেনি। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে আবছা দেখা যায়। চারদিকে গাছের জটলা। অল্প অল্প বাতাস শুরু হয়েছে। সেই বাতাসে গাছের পাতাগুলো শিরশির করে কাঁপছে। আর কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় পথ হারিয়েছি। সম্ভবতঃ জঙ্গলের মধ্যে একাধিক পায়ে-চলা পথ আছে। একটা পথের বদলে আর একটা পথ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করেছি।

এখন উপায়।

লাঠিটা ঠুকে চিৎকার করলাম, কে আছ, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমাকে সাহায্য কর।

একবার, দু'বার, তিনবার। চিৎকারে কোন ফল হল না। শুধু গাছের ডালে বিশ্রামরত কাকের দল কা-কা শব্দ করে ঝটপট করতে করতে উড়ে গেল।

কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে সমস্যার সমাধান হবে না। যে কোন রকমেই হোক, এ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে। নইলে রাত বাড়বে, জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়।

সোজা রাস্তা ধরে এগোতে লাগলাম! গাছপালার যেন আর শেষ নেই। যত এগোই, জঙ্গল যেন তত দুর্ভেদ্য বলে মনে হয়। পায়ের পাশ দিয়ে সরসর করে সুরীসৃপ গতিতে যেসব প্রাণী চলাফেরা করছে, তাদের কথা ভেবে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর মনে হলো জঙ্গল যেন একটু ফিকে হয়ে এল। চারদিকে বিস্তীর্ণ জলাভূমি। অন্ধকারে জোড়া জোড়া জলন্ত চোখ ঘোরাফেরা করছে। বুঝলাম সে চোখের মালিক শিয়ালের দল। জঙ্গল পার হয়ে এসে মনে একটু সাহস হলো। ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখলাম কোথাও যদি আলোর বিন্দু চোখে পড়ে। গ্রামের নিশানা।

হঠাৎ পিছন থেকে বিকট শব্দ এল।

বল হরি, হরিবোল।

সে শব্দে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল, তবু এই ভেবে মনে আশ্বাস পেলাম, এই নির্জন প্রান্তরে আমি একলা নই। আরো লোক আছে। এদের জিজ্ঞাসা করলেই পথের নির্দেশ পাওয়া যাবে। হরিধ্বনি আরো কাছে, আসতেই আমি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালাম। সেটাই নিয়ম। অনন্তপথের যাত্রীকে প্রথমে পথ দেওয়া উচিত। লাঠিতে ভর দিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম!

অন্ধকারে জ্বলন্ত একটা মশাল এগিয়ে আসছে। একটু পরেই শববাহীরা সামনে এল। শুধু চারজন খাটিয়া বয়ে নিয়ে চলেছে। সামনের ডান দিকের লোকটার হাতে মশাল। আর কোন লোক নেই।

শুনুন!

কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করলাম।

বাহকরা থামল না, শুধু চলার গতি একটু মৃদু করল আর চারজনেই আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল। আমি ভীরু এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না, কিন্তু আমার মনে হল শ্লথ-মুষ্টি থেকে লাঠিটা খসে মাটিতে পড়ে যাবে, সমস্ত শরীর অজানা একটা আতঙ্কে শিউরে উঠল।

চারজন লোকেরই ঠিক এক রকম চেহারা। এক ধরনের অবিন্যস্ত চুল, রক্তিম চোখ, এমন কি মুখের বসন্তের দাগ পর্যন্ত। আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়েই বাহকরা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। শুধু যদি দুজনের চেহারার মধ্যে এ ধরনের সাদৃশ্য থাকত, তাহলে ভাবতাম তারা হয়তো যমজ ভাই, কিন্তু এরকম চারজনের অভিন্ন চেহারা হলো কি করে।

মনের মধ্যে অলৌকিক যে প্রসঙ্গ উঁকি দিচ্ছিল, নিজেকে ধমক দিয়ে তার পথ বন্ধ করার চেষ্টা করলাম। আমার চোখের ভুল। মনের মধ্যে ভয়টা বাসা বেঁধেই ছিল, মশালের আলোয় ক্ষণেকের

দেখায় নিশ্চয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। নিজেকে সাহস দেবার জন্য চিৎকার করে গান গাইতে শুরু করলাম। বেসুরো, বেতালা। কিন্তু পরমুহূর্তে 'বল হরি, হরিবোল'-এর বিকট ধ্বনিতে চমকে থেমে গেলাম।

মনে হলো শব্দটা যেন আমার পাশ থেকে উঠছে। অথচ শববাহকের দল ততক্ষণে অনেক এগিয়ে গেছে। তাদের চিৎকার এত কাছে শ্রুতিগোচর হবার কথা নয়। মনের মধ্যে একটু অস্বস্তি শুরু হলো। কিন্তু এভাবে চুপচাপ পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে বিপদ বাড়বে। তাই জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে চললাম।

লক্ষ্য করিনি, আকাশ কখন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। ছুরির ফলার মতন বিদ্যুতের শাণিত স্ফুরণ। দমকা হাওয়া উঠল। হাওয়ার এমন বেগ যে এগোন দুষ্কর হয়ে পড়ল।

আবার সেই চিৎকার। এবারে যেন একেবারে কানের পাশে। বল হরি, হরিবোল।

চিন্তা করে লাভ নেই। চিন্তা করে এ ব্যাপারে জট ছাড়ান যাবে না। রহস্য যাই হোক, যে ভাবেই হোক আমাকে প্রাণে বাঁচতে হবে। কোন রকমে একটা লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

বড় বড় বৃষ্টির ফলা। সারা গায়ে হুল ফোঁটাতে শুরু করল। ছুটতে আরম্ভ করলাম। লাঠিটা বগলে চেপে। জানি না বোধহয় আধ মাইলেরও বেশী একটানা দৌড়েছি। হিসাব রাখিনি। হঠাৎ আর একবার বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখলাম, পথের পাশে একটা চালাঘর।

মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম। বিপততারণ তুমি আছ, দুর্বলের ত্রাণকর্তা। ছুটে গিয়ে চালাঘরে আশ্রয় নিলাম। মনে মনে ভাবলাম, অন্ততঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শরীরটা বাঁচবে। এমনও হতে পারে চালাঘরে কোন লোকের সাক্ষাৎ মিলবে। রাতের নির্ভর।

অন্ধকারটা চোখে একটু সহ্য হতে বুঝলাম চালাঘর নয়, শুধু চালা। তিন দিক আচ্ছাদিত, এক দিক খোলা। বোধ হয় রোদের তাপ কিংবা বৃষ্টির প্রকোপ থেকে পথচারীকে বাঁচাবার জন্যই এটি তৈরি হয়েছিল। আস্তে আস্তে এগোতে গিয়েই থেমে গেলাম।

কড়কড় কড়াৎ। প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হলো। তার আগে বিদ্যুতের আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে গেল। সেই আলোতেই দেখলাম। এবার আরো স্পষ্ট, আরো নিকটে।

শবটি সামনে রেখে চারজন পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সারি দিয়ে। হুবহু এক চেহারা। এমন কি অসংস্কৃত দাড়ি গোঁফের মাত্রা পর্যন্ত।

চোখাচোখি হতেই চারজন একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। শিকারকে যেন কুক্ষিগত করার উল্লাসে। লাঠিটা বজ্রমুষ্টিতে ধরে পাষাণমূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রইলাম। নিঃসন্দেহ হলাম, এ হাসি স্বাভাবিক নয়। রক্তমাংসের কোন লোক এভাবে হাসতে পারে না। অশরীরী আত্মার বীভৎস হাসি। আমাকে আবার আতঙ্কিত করে একজন খনখনে গলায় বলল, আপনি একটু মৃতদেহের কাছে থাকুন, আমরা কাঠের ব্যবস্থা করে আসি।

কোন রকমে নিঃশ্বাস রোধ করে বললাম, আপনারা সবাই যাবেন?

আবার সেই রক্ত-জলা-করা হাসি।

আমরা যেখানে যাই, একসঙ্গেই যাই।

যাবার আগে লোকগুলো মশালটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। বৃষ্টি থেমে গেছে। মাঝে মাঝে শুধু মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমক। আড়চোখে চেয়ে দেখলাম। সাদা কাপড়ে শবের আগাগোড়া ঢাকা। মশালের আলোয় সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আচমকা দমকা হাওয়ায় শবের আবরণ সরে গেল। আমি একবার সেদিকে দেখেই চিৎকার করে উঠলাম।

একেবারে এক মুখ। গোঁফ, দাড়ি, চুল, গড়ন কোথাও কোন প্রভেদ নেই। এমন কি বসন্তের দাগ পর্যন্ত। দু'হাতে চোখ দুটো রগড়ে নিলাম। এও কি সম্ভব। শব আর চারজন বাহকের আকৃতিতে কোন তফাত নেই। বুকের মধ্যে স্পন্দন দ্রুততর হলো। লাঠিটা আঁকড়ে ধরার শক্তিও যেন ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। তারপর যা ঘটল, তা অবর্ণনীয়।

শব চোখ খুলল। রক্তিম দুটি চোখ। প্রথমে দুটো ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠল, তারপর খনখনে গলার স্বর ভেসে উঠল। একটু উঠে বসার মত করে বললে ঃ

ঠিকই ভেবেছ! আমরা পাঁচজন একই লোক। কোন তফাত নেই। বসন্ত রোগে মারা গিয়েছিলাম বলে প্রতিবেশীরা কেউ ভয়ে পোড়াতে এল না! দেহের সৎগতি হবে না? তাই নিজের দেহ থেকে চারজন বাহক সৃষ্টি করলাম। তারাই বয়ে নিয়ে এল শ্মশানে। কেমন বুদ্ধি বার করলাম বল তো? হো, হো, হো!

তারপর আমার কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হলো দেখলাম পথের একপাশে কর্দমাক্ত দেহে পড়ে আছি। পরনের পোশাক ছিন্নভিন্ন। জেলেরা আমার মুখে চোখে জল দিচ্ছে। বাতাস করছে।

একটু সুস্থ বোধ করে উঠে বসলাম। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। চালাঘর আছে, কিন্তু শূন্য। রাতের বিভীষিকা কোথাও নেই।

আস্তে আস্তে বললাম, লোচনপুর স্টেশন এখান থেকে কত দূর?

লোচনপুর? এখান থেকে পাক্কা দশ মাইল। একেবারে উল্টো দিকে।

এ জায়গার নাম কি?

এটাকে বলে পাঁচ মুণ্ডীর আসর।

পাঁচ মুণ্ডীর আসর? চমকে উঠলাম।

হ্যাঁ গো কত্তা। এক রকমের পাঁচজন তেনাদের দেখা যায়। পথ ভুলিয়ে লোককে এখানে নিয়ে আসে। তারপর সাবাড় করে দেয়। তুমি বামুন বলে বোধহয় বেঁচে গেছ।

ছেঁড়া পরিচ্ছদের ফাঁক দিয়ে পৈতাটা দেখা যাচ্ছিল।

এ কাহিনী অনেককে বলেছি, কেউ বিশ্বাস করেছে, কেউ করেনি। কিন্তু যারা বিশ্বাস করেনি তারা রাতের বেলা পুবাই গাঁ থেকে পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরে পাঁচ মুণ্ডীর আসরের দিকে কেউ আসতে রাজী হয়নি। আমাকে যদি কেউ এক থলি আকবরী মোহর দেয়, তবু আমি ও পথে আর জীবনে যাব না।

আমরা ভূতেরা

ছেলেবেলা থেকে আমার ভূত খোঁজার নেশা। যখনই পোড়োবাড়ির খোঁজ পেয়েছি, যেটা ভূতেদের আস্তানা, সব কাজ ফেলে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছি। গুরুজনদের হাজার নিষেধ সত্ত্বেও রাত কাটিয়েছি সেখানে, কিন্তু ভূতের সন্ধান পাইনি।

কতবার যে শ্মশানে ঘুরেছি তার ঠিক-ঠিকানা নেই। অমাবস্যার রাতে কুকুর-শিয়ালদের আগুনজ্বলা চোখ দেখেছি। এলোমেলো বাতাসে মড়ার খুলি থেকে অদ্ভুত শব্দ বের হয়েছে, তাও শুনেছি, ভয় পাইনি। সব দেখেশুনে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি, ভূত নেই, ভূতের কাহিনী মানুষের কল্পনা। যাঁরা বলেছেন, স্বচক্ষে ভূত দেখেছেন, তাঁরা নিছক চোখের ভুলের শিকার হয়েছেন।

সভা-সমিতিতে, বন্ধুবান্ধবদের আসরে সরবে ঘোষণা করেছি, যে যাই বলুক, ভূতটুত নেই। প্ল্যানচেট একটা নিছক ধাপ্পাবাজি।

ঠিক এমনই সময়ে চিঠি এল। চিঠিটা লিখেছে শৈলেন। আমার কলেজের অন্তরঙ্গ বন্ধু শৈলেন দাস। শৈলেনও আমার মতন বিশ্বাস করত, ভূত নেই। ভূতের নিবাস মানুষের অলস মস্তিষ্কের 'এক কোণে।'

চিঠিটা খুব ছোট! মাত্র লাইন দুয়েকের।

যদি ভূত দেখতে চাও, অবিলম্বে ঘাটশিলায় আমার কাছে চলে এস। —শৈলেন।

শৈলেনের সঙ্গে কলেজ ছাড়ার পর আর বিশেষ দেখা হয়নি। অন্য বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম, সে আমলকি আর হরতুকির ব্যবসা করে। ঝাড়গ্রাম না ঘাটশিলা কোথায় রয়েছে।

চিঠি পেয়ে বুঝলাম, শৈলেন ঘাটশিলায় রয়েছে।

হয়তো ভূতটুত সব বাজে কথা, আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবার জন্য ভূতের অবতারণা করেছে। জানে, এমন করে লিখলে আমি না গিয়ে পারব না।

কলেজে অধ্যাপনার কাজ। বছরের মধ্যে ছুটিই বেশি। পূজা পার্বণ, গরমের ছুটি তো আছেই, এছাড়া অন্যান্য উপলক্ষে কলেজ প্রায়ই বন্ধ থাকে।

ঠিক করলাম, দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে ঘাটশিলায় চলে যাব!

পূজা কেটে গেছে। বাতাসে শীতের মিশেল। এ সময়ে ঘাটশিলার জলবাতাস ভাল। কড়া শীত পড়েনি। ভূতের সন্ধান না পাই, স্বাস্থ্যটা ফিরিয়ে আনতে পারব।

যে-কথা সেই কাজ। সুটকেশ আর বিছানা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। ট্রেন ছাড়ার দেরি ছিল। কামরার এক কোণে মালপত্র রেখে একটা পত্রিকা কিনে বেঞ্চের ওপর বসলাম।

একটা গল্পের লাইন দুয়েক পড়েছি, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠে চমকে উঠলাম—"আরে কী খবর?"

মুখ তুলে অবাক হলাম। সামনে দাঁড়িয়ে শৈলেন। বগলে খবরের কাগজ। হাতে রঙিন ব্যাগ।

"খবর আর কী? ভূত দেখাবার জন্য তুই-ই তো নেমন্তন্ন করেছিস।"

ভূতের উল্লেখে শৈলেনের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। দু' চোখে আতঙ্কের ছায়া। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। "কীরে, কথা বল?"

"কী বলব, ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, তোর কথা মনে হলো তাই তোকে চিঠি লিখলাম।"

"ভালই করেছিস। ভূত যদি নাই পাই, তোর ঘাড়ে চেপে সাতটা দিন তো খেয়ে আসি।"

শৈলেন বলল, "চল, এবার ট্রেন ছাড়বার সময় হয়েছে। তুই কোন কামরায় উঠেছিস?"

আঙুল দিয়ে কামরাটা দেখিয়ে দিলাম।

দু'জনে উঠে পাশাপাশি বসলাম। ট্রেন ছাড়তে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কী ব্যাপার বল তো? তুই তো সাতজন্মে ভূত বিশ্বাস করতিস্ না। ঠিক আমার মতন! কী দেখলি?

স্পষ্ট দেখলাম শৈলেনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। গালের পেশীগুলো কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। সে মৃদুকণ্ঠে বলল, "হঠাৎ বাতি বন্ধ হয়ে যেত। এক তিল হাওয়া নেই, দরজা জানলাগুলো নিজেদের ইচ্ছামত খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। পাশের ঘরে খুটখাট শব্দ, গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই।"

এক ব্যাপার। যারাই ভূতের উপদ্রবের কথা বলেছে, তারা সবাই ঠিক একই কাহিনী শুনিয়েছে। এই হঠাৎ বাতি নিভে যাওয়া, আচমকা জানলা দরজা খুলে যাওয়া।

সে সব ঘরে রাতের পর রাত কাটিয়েছি. কিছুই দেখতে পাইনি। পাশের ঘরের খুটখাট শব্দ ইঁদুরের জন্যে। বেড়াল আমদানি করতেই সে শব্দ থেমে গেছে। লাইনের গোলমালের জন্য বাতি হঠাৎ ফিউজ হয়ে গেছে। তাই হাসতে হাসতে বললাম, "এসব ব্যাপারে তুইও ভয় পেয়ে গেলি

শৈলেন? এর মধ্যে ভূত এল কোথা থেকে?"

শৈলেন আমার একটা হাত চেপে ধরল।

ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, "ওসব কথা থাক ভাই। অন্য কথা বল। যা দেখবার গিয়েই দেখাব।"

কাজেই অন্য কথা পাড়লাম। শৈলেনের ব্যবসার কথা। "তারপর তোর ব্যবসা কেমন হচ্ছে বল?"

শৈলেন বলল, "প্রথম প্রথম তো বেশ ভালই চলছিল। আমলকি আর হরতুকি কোনটাই কিনতে হতো না। ট্রাক নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে স্রেফ পেড়ে নেওয়া। তারপর সেই ট্রাক বড়বাজারে নিয়ে আসা। ইদানীং মুশকিল হয়েছে।"

"কী মুশকিল?"

"যারা সব জঙ্গল ইজারা নিচ্ছে, তারা জঙ্গলে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমলকি, হরতুকি চালান তারাই দিচ্ছে। কিনতে গেলে এমন দর হাঁকছে যে, আমার পোষায় না।"

"তাহলে কী করবি?"

"ভাবছি অন্য ব্যবসা ধরব!"

"কী ব্যবসা?"

"ঠিক করিনি, তুই চল, দু'জনে বসে ঠিক করা যাবে। তবে ঘাটশিলায় আর নয়।"

"কেন?"

"না ভাই ঘাটশিলায় আর থাকব না। থাকতে পারব না। অন্য কোথাও যেতে হবে।"

তারপর আর বিশেষ কথা হলো না।

দু'জনে দু'খানা পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। খেয়াল হলো খড়গপুর স্টেশনে আসতে।

শৈলেন বলল, "তুই বস্। আমি খাবারের চেষ্টা দেখি।"

শৈলেন নেমে যেতে কামরার চারদিকে নজর দিলাম। ভিড়ে আমার চিরকালের ভয়। এই ভিড়ের ভয়ে বাইরে বের হওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। ঘাটশিলা চলেছি তাও প্রথম শ্রেণীতে।

কিন্তু প্রথম শ্রেণী একেবারে খালি নয়। চারজনের জায়গায় ছ'জন বসেছি। সকলের টিকিট আছে কিনা কে জানে। আজকাল তো টিকিট না করাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে দৃষ্টি দিলাম। খড়গপুর স্টেশন বদলায়নি। খড়গপুর এসেছিলাম বছর পাঁচেক আগে। খড়গপুরে ঠিক নয়, খড়গপুরে নেমে দীঘা গিয়েছিলাম বাসে। স্বাস্থ্যের কারণে নয়, ভূতের সন্ধানে।

কে একজন খবর দিয়েছিল, সমুদ্রের ধারে এক পরিত্যক্ত বাড়িতে ভূত থাকে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামলেই নানা রং-এর আলোর রেখা বাড়ির মধ্যে নাচতে থাকে। বাইরের সমুদ্রের গর্জন সেই সময় নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সেই সব আলোর রেখা যার দেখবার দুর্ভাগ্য হয়, তার মাথার গোলমাল হয়। খবর সংগ্রহ করে জেনেছিলাম, কে একটা লোক সম্পত্তির লোভে কাকে যেন গলা টিপে এই বাড়িতে দম বন্ধ করে মেরে ফেলেছে।

সেই লোকটিও আর ফিরতে পারেনি। যতবার বেরোতে গেছে, রঙীন আলোর রেখা তার পথ

আটকে ধরেছে। শুধু আলোর রেখাই নয়, সঙ্গে করুণ একটা আর্তস্বর। লোকটির মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল। অজ্ঞান অবস্থায় অন্য লোকেরা তাকে বাইরে নিয়ে আসে। জ্ঞান হলে তার কথাবার্তা শুনে রাঁচীর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখানেই কিছুদিন পর লোকটির মৃত্যু হয়।

সন্দেহ নেই, খুব জমজমাট গল্প। আমি গিয়ে সাতদিন ছিলাম।

রঙীন আলো তো দূরের কথা, কোন আলোই দেখতে পাইনি। শুধু ভাঙা ছাদের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়া হু-হু শব্দে বইত। সেই হাওয়ায় জরাজীর্ণ বাড়ির পলেস্তারা ঝুপ ঝুপ করে খসে পড়ত।

দীঘার ভূতের ব্যাপারে নিমগ্ন ছিলাম, খেয়াল হলো ট্রেন নড়ে উঠতে। তাই তো, ট্রেন ছেড়ে দিল, অথচ শৈলেন কোথায়? শৈলেন না উঠতে পারলেই মুশকিল।

এই প্রথম মনে পড়ল, শৈলেনের চিঠিতে তার বাসার কোন ঠিকানা ছিল না। অবশ্য তাতে খুব অসুবিধা হতো না।

ঘাটশিলা এমন কিছু বড় জায়গা নয়। সেখানে বাঙালীও কম নেই। তাদের কাছে শৈলেন দাসের আস্তানা পাওয়া দুরূহ হতো না। একটু পরেই শৈলেন এসে দাঁড়াল।

"কীরে, ট্রেন ছিড়ে দিয়েছে, কোথায় ছিলি।"

"একেবারে গরম ভাজিয়ে আনতে একটু দেরি হয়ে গেল! ছুটতে ছুটতে হাতল ধরেছি। নে খা।"

শৈলেন প্রচুর গরম লুচি এনেছে। লুচি আর তরকারি। খাওয়ার পর ভরপেটে বেশ একটু ঢুলুনি এল। যখন চোখ খুললাম, তখন ট্রেন ঘাটশিলা স্টেশনে ঢুকছে। বেশ লম্বা ঘুমিয়েছি। চোখ চেয়ে দেখলাম পাশে শৈলেন নেই। বগলে বিছানা, হাতে সুটকেশ ঝুলিয়ে তৈরি হয়ে নিলাম।

একটু এগোতেই দেখলাম, শৈলেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

স্টেশনে নামা গেল। বেশ ঝকঝকে বাতাস বইছে। পাহাড়ী ঠাণ্ডা। স্টেশনের বাইরে আসার পর শৈলেন বলল, "তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি একটা সাইকেল-রিকশা ডেকে নিয়ে আসি। এখানে থেকে বেশ দূর। রঙ্কিনী দেবীর মন্দিরের কাছে আমার ডেরা।"

শৈলেন সিঁড়ি দিয়ে বাইরে নেমে গেল। আবছা অন্ধকার। তার মধ্য দিয়ে দেখলাম প্রচুর সাইকেল-রিকশা গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। গোটা তিনেক ট্যাক্সিও রয়েছে।

দশ মিনিট, পনের মিনিট—কুড়ি মিনিট কাটল। শৈলেনের দেখা নেই।

আশ্চর্য, সাইকেল-রিকশা ডাকতে দেরি হবে কেন! আধ ঘণ্টা কাটাবার পর বিরক্ত হয়ে মালপত্র নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে তখনও গোটা দুয়েক সাইকেল-রিকশা দাঁড়িয়ে।

একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, দেবীর মন্দির চেন? হ্যাঁ, হুজুর, বৈঠিয়ে। সাইকেল-রিকশাচালক হাত থেকে বাক্স বিছানা নিয়ে পাদানীতে রাখল। দরদস্তুরই করতে দিল না। উঠে বসলাম। শৈলেনের অদ্ভুত আচরণের কোন অর্থ খুঁজে পেলাম না। এ ধরনের রসিকতা অভদ্রজনোচিত, দেখা হলে সেটা বলে দেব। বেশ অনেকটা পথ। ঝাঁকুনিতে কোমরে ব্যথা হয়ে গেল। সাইকেল-রিকশাওয়ালাকে যখনই জিজ্ঞাসা করি, "আর কত দূর রে?" সে বলে, "আগিয়া হুজুর।"

অবশেষে মন্দির নজরে এল। তার কাছে একতলা একটা বাড়িও দেখতে পেলাম। কাছে যখন আর কোন বাড়ি নেই, তখন এটাই শৈলেনের আস্তানা হবে। সাইকেল-রিকশার ভাড়া মিটিয়ে বাক্স বিছানা নিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাত দিয়ে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। তার মানে দরজা ভেজানো ছিল। ভিতরে জমাট অন্ধকার। সুটকেশ খুলে টর্চ বের করলাম। আমাকে ভয় দেখাবার জন্য শৈলেনের বদমায়েসি? আগেভাগে চলে এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকে কোন ফন্দী আঁটছে। ঘরের কোণে টর্চের আলো পড়তেই চিৎকার করে উঠলাম। মেঝের ওপর শৈলেন পড়ে রয়েছে। চিত হয়ে। দুটি চোখ বিস্ফারিত। মনে হয় খুব ভয় পেয়েছে। দু' কষ বেয়ে রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে। তার দেহে যে প্রাণ নেই, এটা বোঝবার জন্য কাছে যাবার দরকার হলো না।

মনে হলো কেউ গলা টিপে তাকে হত্যা করেছে। তখনও টর্চের আলো শৈলেনের দেহের ওপর। তার শরীর ঘুরে গেল। কে যেন ঘুরিয়ে দিল দেহটাকে।

চোখ দুটো আরো বিস্ফারিত। গালের মাংসপেশীগুলো তিরতির করে কাঁপছে। আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলো না। তীরবেগে রাস্তার ওপর এসে পড়লাম।

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা মোটর ছুটছিল। আর একটু হলে মোটরের তলায় পড়তাম।

চালক ক্ষিপ্রহাতে মোটর থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এ কী, পাগলের মতন ছুটছেন কেন? চাপা পড়তেন যে?" জ্ঞানশূন্য হয়ে কেন ছুটছিলাম চালককে বললাম। ভদ্রলোক বাঙালী। গলায় স্টেথস্কোপ দেখে মনে হলো ডাক্তার।

ডাক্তার সব শুনে বলল, "কী বলছেন আপনি? শৈলেনবাবু তো আজ দিন দশেক হলো মারা গেছেন। রহস্যজনকভাবে মৃত্যু। গলা টিপে কারা মেরে রেখে গেছে।"

চোর, ডাকাত? ডাক্তার মাথা নাড়ল, "না, না, পয়সাকড়ি সব ঠিক ছিল। জিনিসপত্র একটু এদিক ওদিক হয়নি। বাড়িটার খুব বদনাম আছে। এর আগেও দু'জন এভাবে মারা গেছেন। কিন্তু আপনি দেখলেন কী করে? পুলিশ থেকে তো দরজায় তালা দিয়ে গেছে।

বললাম, "কই না তো। দরজা তো খোলা।" "চলুন তো দেখি।"

টর্চের আলো ফেলতেই চমকে উঠলাম। দরজায় বিরাট আকারের দুটো তালা।

ডাক্তার এ নিয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। শুধু বলল, "স্টেশনে যাবেন তো চলুন। আমি ওই দিকে যাব।" রাস্তায় একটি কথাও হলো না। কোনো কথা বলবার মতন মনের অবস্থা আমার ছিল না। শৈলেনের বীভৎস দু'চোখের দৃষ্টি আমাকে মূক করে ফেলেছিল।

প্ল্যাটফর্মে বেঞ্চের ওপর বসলাম। জানি, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। যে লোকটা দশ দিন আগে মারা গেছে, সে হাওড়া থেকে ঘাটশিলা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসেছে, নিজের মৃতদেহ দেখাবার জন্য, এমন আজগুবি কথা কে বিশ্বাস করবে। দরজায় তালা আটকানো, মৃতদেহ কবে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে, অথচ টর্চের আলোয় শৈলেনের সেই বীভৎস রূপ কী করে দেখলাম।

ঠাণ্ডা ঝনঝনে হাওয়া। কানের পাশে মৃদুকণ্ঠ, আমরা আছি, আমরা আছি। অবিশ্বাস করো না।

অবিকল শৈলেনের গলা।

ভূতুড়ে রাত

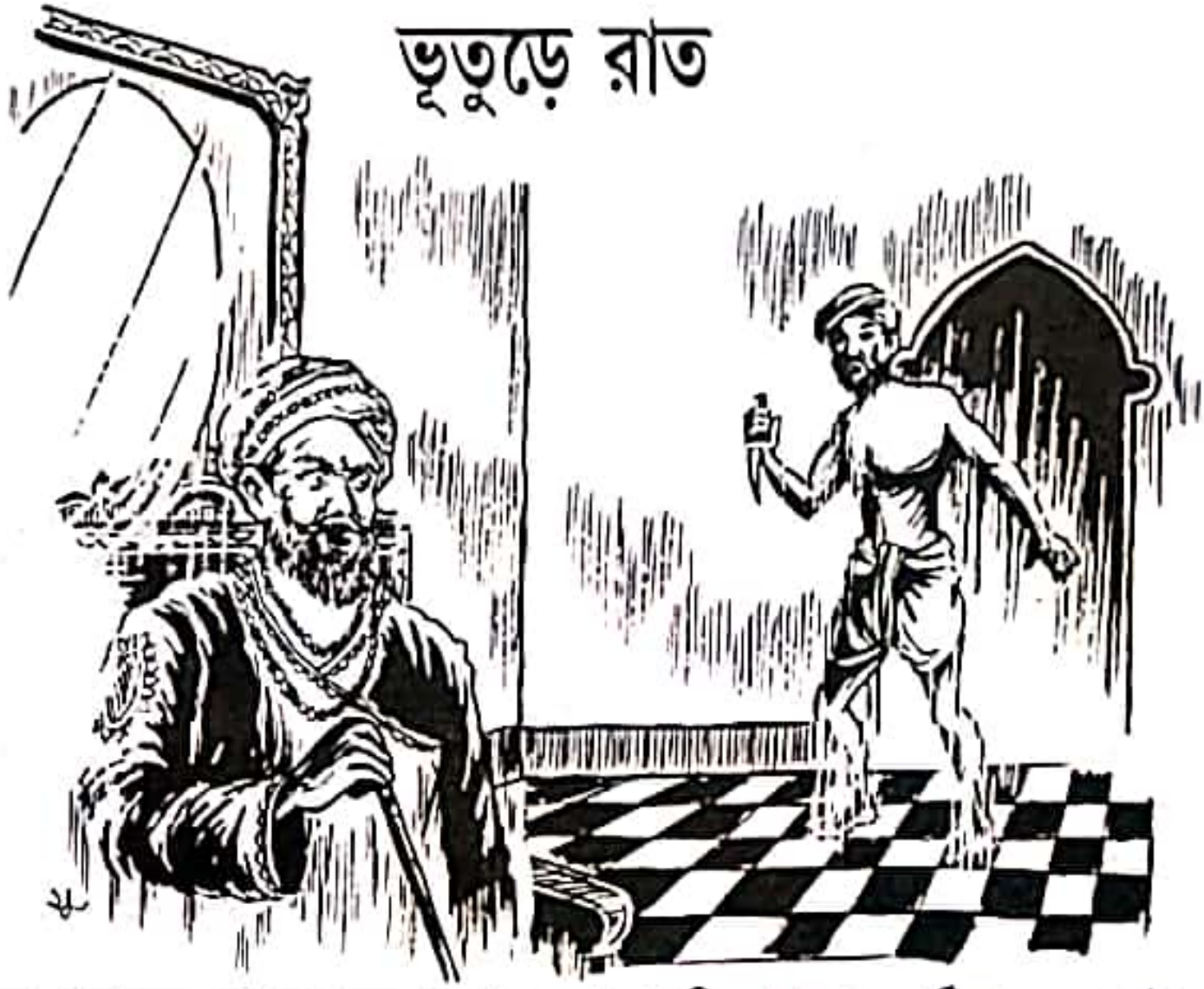

সভা শেষ হতে বেশ রাত হয়ে গেল। আমার যে বাড়িতে রাত্রে থাকা ঠিক হয়েছে সেটা শহরের বাইরে। ডাকবাংলোয়। কর্মকর্তাদের একজন মোটরে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। কিন্তু পথে বিপত্তি।

শহর ছাড়িয়ে একটু গিয়েই মোটর বিকল হল। আধঘণ্টা ধরে অনেক চেষ্টা করেও মোটর চালু করা গেল না।

ঘড়িতে রাত তখন এগারোটা দশ। কর্মকর্তা বললেন, মুস্কিল হল দেখছি, এক কাজ করা যাক, সামনেই রাজাবাহাদুরের বাড়ি।

রাতটা সেখানেই কাটানো যাক। ফিকে জ্যোৎস্নায় বিরাট অট্টালিকার অস্পষ্ট কাঠামো দেখা গেল।

মস্ত বড় লোহার ফটক। কর্মকর্তা ফটকের এপার থেকে চীৎকার শুরু করলেন, দারোয়ান, দারোয়ান।

অনেকক্ষণ ডাকার পর আধবুড়ো এক দারোয়ান এসে দাঁড়াল। কর্মকর্তাকে চিনতে পেরে সেলাম করল। নীচের দুটো ঘর খুলে দাও।

মোটর খারাপ হয়ে গেছে, আমরা রাতটা এখানে কাটাব। দারোয়ান বিড়বিড় করে কি বলল,

তারপর কোমরে বাঁধা চাবির গোছা থেকে চাবি বের করে দুটো ঘর খুলে দিল। একটি ঘরে আমি আর একটায় কর্মকর্তা আর ড্রাইভার। ঘরের মধ্যে পা দিয়েই বুঝতে পারলাম ঘর রীতিমত ঝাড়পোঁছ করা হয়। কোথাও একতিল ময়লা নেই। উঁচু খাট, তার উপর পরিষ্কার বিছানা। ঝালর দেওয়া দুটো বালিশ।

সারারাত বাতি জ্বেলে ঘুমানো আমার অভ্যাস। অন্ধকারে একেবারেই ঘুম হয় না। কম পাওয়ারের নীলাভ বাতিটা জ্বেলে রাখলাম। শুয়ে শুয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে চোখে পড়ে গেল, পায়ের দিকের দেওয়ালে একটা তেল রঙয়ের ছবি।

প্রায় সিংহাসনের মতন কারুকার্য করা একটা চেয়ারে একজন প্রৌঢ় বসে, অঙ্গে জমকালো পোশাক, প্রকাণ্ড মুখ। বিরাট গোঁফ। রক্তাক্ত দুটি চোখ। যেন জ্বলজ্বল করছে। ইনিই সম্ভবত রাজাবাহাদুর, এই অট্টালিকার মালিক ছিলেন। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। গাছের পাতায় পাতায় নূপুরের আওয়াজের মতন। এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

খট্—খট্—খট্—

ঘুমের মধ্যে শব্দ কানে এল। প্রথমে মনে হল ঝড়ের বেগে জানলার পাল্লা কাঁপছে। তারপর মনে হল, কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। এত রাতে কে দরজা ঠেলছে। তবে কি কোন কারণে কর্মকর্তা কিংবা ড্রাইভার ডাকছে। দু হাতে চোখ রগড়ে উঠে বসলাম।

না। যেদিকে দরজা, শব্দটা সেদিক থেকে আসছে না। ফিরতেই সারা শরীর কেঁপে উঠলো। আমি ভীরু এমন বদনাম কেউ দেবে না, কিন্তু চোখের সামনে এমন এক দৃশ্যকে অস্বীকারই বা করি কি করে!

ছবির ফ্রেমটুকু রয়েছে, রাজাবাহাদুর নেই। ছবির ঠিক নিচে রাজাবাহাদুর বসে।

এক পোশাক এক ভঙ্গী। নিশ্চল, নিথর, তবু হাতের মোষের শিং-এর ছড়িটা মেঝের উপর ঠুকছেন, খট্ খট্ খট্। আমার মনে হল শরীরের সমস্ত রক্ত জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। চীৎকার করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি। চুপচাপ বসে রইলাম।

বাইরে ঝড়ের গতি আরও উদ্দাম। হঠাৎ এক সময় শব্দ করে দরজা খুলে গেল। হাওয়ার ঝলকের সঙ্গে দীর্ঘ কৃশ চেহারার একজন ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। এগিয়ে আসতে দেখতে পেলাম লোকটার খালি গা, আধ ময়লা ধুতি হাঁটুর ওপর তোলা। মাথায় মোটা টিকি। এদেশের চাষা ভুষো শ্রেণীর লোক বলেই মনে হয়।

লোকটা রাজাবাহাদুরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভ্রুকুটী ফুটে উঠল।

কে?

আমি ঠাকুরপ্রসাদ।

ঠাকুরপ্রসাদ। এখানে এত রাত্রে কি দরকার।

আমার ছেলে শিউপ্রসাদ কই?

শিউপ্রসাদ, তা আমি কি করে জানব।

হ্যাঁ তুমি জান। তোমার লোক তাকে ধরে এনেছে। আমার খাজনা বাকি ছিল, দু'সাল ধরে দিতে পারছি না, তাই তোমার লোক আমার ছেলেকে ধরে এনেছে। বল কোথায়?

মনে হল রাজাবাহাদুর যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। একবার খোলা দরজার দিকে দেখলেন, এই আশায় যদি তাঁর কোন পাইক, এ ঘরে এসে পড়ে। কিন্তু না, কেউ এল না, এই গভীর রাতে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সবাই বোধহয় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। কেউ এল না দেখে রাজাবাহাদুর বললেন, আমি তোমার ছেলের কথা জানি না। তুমি যেতে পার।

যাবার জন্য আমি আসিনি।

ঠাকুরপ্রসাদের গলায় যেন সিংহ গর্জনের সুর।

তার মানে?

তার মানে?

আমি প্রথমে ভাবলাম, বুঝি বিদ্যুৎ চমকালো। না বিদ্যুৎ নয়, ঠাকুরপ্রসাদ কোমর থেকে ধুতির আড়ালে লুকানো প্রকাণ্ড একটা ভোজালি বের করল।

এ.কি?

রাজাবাহাদুর আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন। শিউপ্রসাদকে আমার চাই, নইলে তোমাকে প্রাণে বাঁচতে দেব না। বল শিউপ্রসাদ কোথায়?

চোরা কুঠুরিতে।

বলতে বলতে রাজাবাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়েই দেয়ালে ফটোর পিছনে হাত দিয়ে কি একটা টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘড় ঘড় করে শব্দ।

বিস্মিত হয়ে দেখলাম দেয়ালটা দুদিকে সরে কিছুটা ফাঁক হয়ে গেল। রাজাবাহাদুর সেই দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ওই যে চোরা কুঠুরি। ওইখানে তোমার ছেলে আছে।

ঠাকুরপ্রসাদ যেভাবে নেমে গেল, মনে হল যেন সিঁড়ি আছে। একটু পরেই একটা আর্তনাদ শোনা গেল। ঠাকুরপ্রসাদ উপরে উঠে এল। তার কোলে মরা ছেলে। শিউপ্রসাদ, শিউপ্রসাদ, বাপ আমার। তার কান্নার শব্দে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। মরা ছেলেকে মেঝের ওপর ন্যামিয়ে রেখে ঠাকুরপ্রসাদ সোজা হয়ে রাজাবাহাদুরের মুখোমুখি দাঁড়াল।

বজ্র গর্জনে বলল, আর নয়, তোমার অত্যাচার অনেক সহ্য করেছি। এবার প্রতিশোধ নেব। যে ভোজালিটা কোমরে গুঁজে রেখেছিল, সেটা সে আবার টেনে বের করল।

আমি ভয় পেলাম। এখনই আমার চোখের সামনে একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে ভেবে চীৎকার করে উঠলাম।

কি আশ্চর্য, গলা দিয়ে একটু স্বর বের হল না। রাজাবাহাদুর চেঁচালেন রামলোচন, পিয়ারীলাল। ঠাকুরপ্রসাদ জোরে হেসে হাঃ হাঃ হাঃ, কেউ আসবে না। সবাই যাত্রা শুনতে গেছে। সেই খবর পেয়েই আমি এসেছি। ভগবানের নাম স্মরণ কর। তারপর কি হয়ে গেল। আমার চারদিকে ধোঁয়ার রূপ। সেই ধোঁয়ার মধ্যে রাজাবাহাদুর আর ঠাকুরপ্রসাদ হারিয়ে গেল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সবে ভোর হচ্ছে। কাঁচের জানলা দিয়ে সূর্যের প্রথম কিরণ এসে বিছানার ওপর পড়েছে। বিছানা থেকে উঠেই ফটোর দিকে দেখলাম রাজাবাহাদুরের প্রকাণ্ড মূর্তি। নেমে ফটোর পিছনে হাত দিয়ে দেখলাম। চোরাকুঠুরি খোলার কোন বোতাম দেখতে পেলাম না। মেঝে নিরীক্ষণ করে দেখলাম। কোথাও কোন ফাটল নেই। তাহলে সবই আমার মনের ভুল কিংবা স্বপ্নে সব কিছু দেখেছি। দরজা খুলে বাইরে এলাম। গেটের কাছে দারোয়ান বসে। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে উঠে সেলাম করল। তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম। আচ্ছা এখানে চোরা কুঠুরিটা কোথায়। দারোয়ান চমকে উঠল, চোরাকুঠুরি।

হ্যাঁ, যেখানে রাজাবাহাদুর প্রজাদের ধরে এনে রাখতেন।

আপনাকে এসব কে বলল বাবুজী?

যেই বলুক। কথাটা সত্যি কি না তুমি বলনা?

দরোয়ান চাপা গলায় বলল, আমি কিছু জানি না বাবুজী। বাবার কাছে শুনেছি, যে ঘরে আপনি শুয়েছিলেন সেখানে চোরাকুঠুরি ছিল। মেঝেটা ফাঁক হয়ে নেমে যাবার রাস্তাও ছিল। রাজাবাহাদুর মরে যাবার পর তার ছেলে বিলাত থেকে ফিরে এসে মেঝে গেঁথে চোরাকুঠুরি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

রাজাবাহাদুরের ছেলে কোথায় থাকেন?

কলকাতায়! মাঝে মাঝে দশ বার দিনের জন্য এখানে আসেন।

আচ্ছা আর একটা কথা!

বলুন বাবুজী।

রাজাবাহাদুর কিভাবে মারা গেছেন?

দারোয়ান তখনই কোন উত্তর দিল না। একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল।

কি হল? বল।

দারোয়ান প্রায় কেঁদে ফেলল। আমি কিছু জানি না বাবুজী। আমার বাবার কাছে শুনেছি, তিনি এক প্রজার হাতে খুন হয়েছিলেন। সে প্রজার নাম ঠুকুরপ্রসাদ।

দারোয়ান উত্তর দেবার আগেই কর্মকর্তার গলা কানে এল।

চলুন মুখ হাত ধুয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। সকালে কলিকাতা ফেরার একটা ট্রেন আছে। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, কিন্তু সে রাত্রের সে দৃশ্যের কথা আমি ভুলিনি, ভুলতে পারিনি। এখনও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে চমকে জেগে উঠি। রাজাবাহাদুরের চীৎকার কানে আসে। রামলোচন, পিয়ারীলাল সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরপ্রসাদের উৎকট হাসি। কেউ নেই—কেউ আসবে না।

ঠাকুরপ্রসাদের পায়ের কাছে মরা ছেলে, হাতে উদ্যত ভোজালি। সে রাত্রে নিছক স্বপ্ন দেখেছি একথা মন মানতে চায় না। অতীতের একটা ঘটনা চোখের সামনে ঘটেছিল, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল?

এর উত্তর আমার জানা নেই।

রাতের প্রহরী

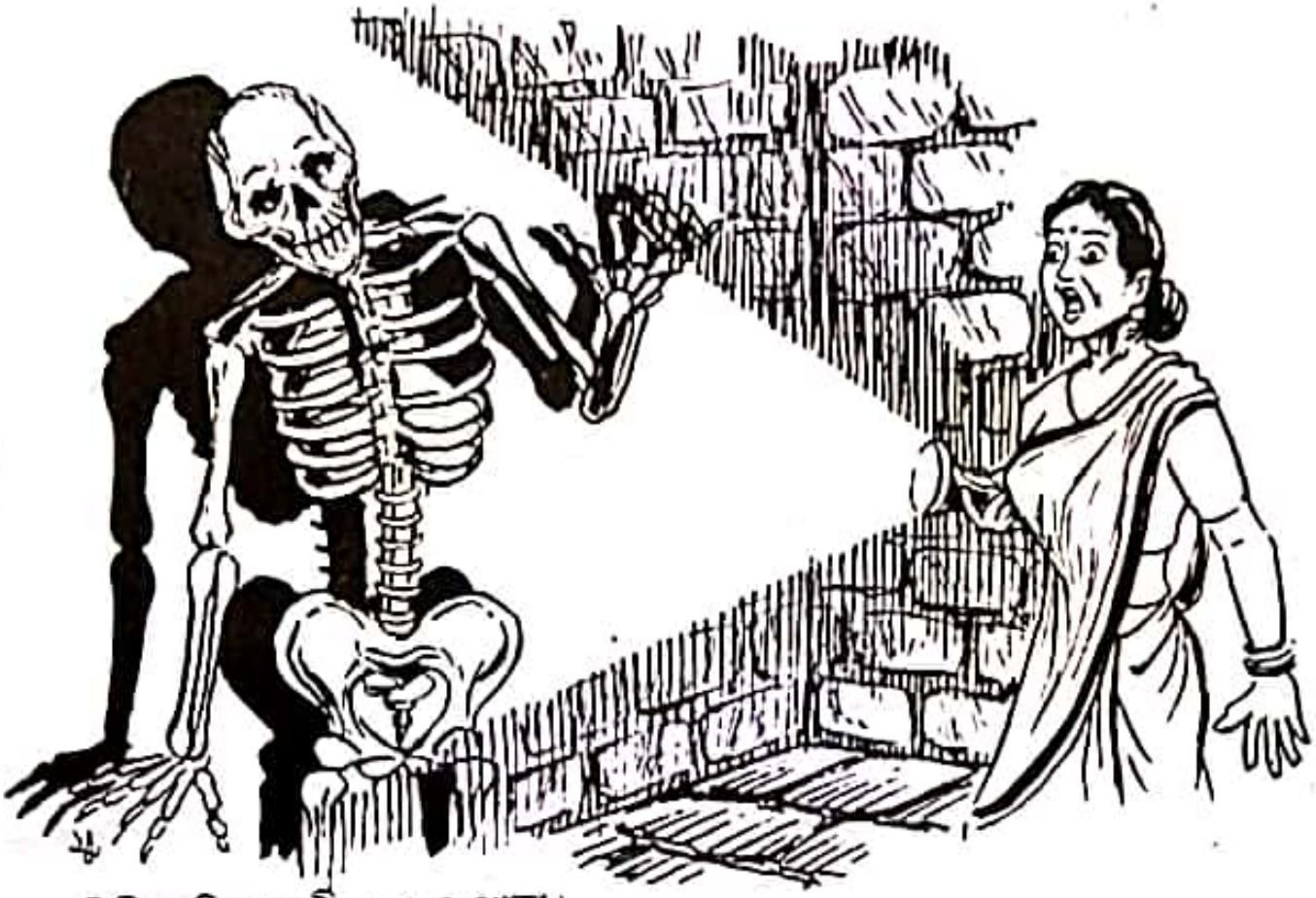

এ কাহিনী অমিয়া-মাসীর কাছে শোনা।

তবে অমিয়া-মাসী হলফ করে বলেছেন, এ কাহিনীতে একটুও ভেজাল নেই, প্রতিটি বর্ণ সত্য। তাঁর জবানীতেই বলি।

জান, শরীরটা বছর দু'য়েক আগে খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। যা খাই, কিছু হজম হয় না। পেটে অসহ্য ব্যথা। চোখ অন্ধকার দেখি। ডাক্তার বললেন, কলকাতা ছাড়তে হবে। এ শহর ব্যাধির ডিপো এখানে থাকলে শরীর সারবে না।

ঠিক হলো কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে মাস দু'য়েক কাটিয়ে আসবো।

ঘাটশিলা, মধুপুর, গিরিডির দেওঘর কোন জায়গাই তোমার মেসোর পছন্দ নয়। জান তো, কি খুঁতখুঁতে মানুষ! বললেন, ও সব বড় ফাঁকা জায়গা, নিরাপদ নয়।

ভাবতে ভাবতে ঠিক হলো লক্ষ্ণৌ। সেখানে আমার দাদা-শ্বশুরের একটি বাড়ি ছিল। বহু পুরানো বাড়ি। উনি শখ করে তৈরি করেছিলেন, যখন লক্ষ্ণৌতে চাকরি, করতেন। সে বাড়ির যে কি অবস্থা তাও জানি না। সেখানেই যাওয়া হলো।

চারবাগ, আমিনাবাদ, জিজ্ঞাসা করে করে বাড়ির পাত্তা মিললো। চক থেকে বেশ দূরে। আশপাশে মুসলমানের বস্তি। ছাগল, মুরগীর পাল ঘুরছে। একতলা বাড়ি। যতটা জরাজীর্ণ হবে ভেবেছিলাম,

অবস্থা ততটা খারাপ নয়। আগেকার দিনের মজবুত মশলার গাঁথনি। যখন বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম তখন বিকাল। রোদ ঝলমল করছে। দু'টো ঘর, বাথরুম। এক ফালি রান্নাঘর।

বাইরে বের হয়ে হোটেলে খাওয়া সেরে নিলাম। তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন প্রায় আটটা। তালা খুলে ঢুকতে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

সেলাম সাহাব।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, দরজার বাইরে একজন। পরনে কালো কুর্তা আর পাজামা, মাথায় কালো টুপি বাঁকা করে বসানো।

তোমার মেসো জিজ্ঞাসা করলে, কৌন?

আপকা গোলাম হুজুর!

বাতি জ্বেলে লোকটাকে ভিতরে ডাকা হলো।

দীর্ঘ চেহারা। কোটরাগত দুটি চোখ, কিন্তু নিষ্প্রভ নয়, জ্বলজ্বল করছে। মুখের কোথাও যেন মাংস নেই। বোঝা গেল অর্ধাহারে এমন চেহারা হয়েছে।

কি চাই?

আপনারা নতুন এসেছেন। কিছুদিন থাকবেন এখানে?

সেই রকম ইচ্ছা আছে! এ আমার দাদুর বাড়ি। বহুদিন আসা হয়নি।

লোকটা নীচু হয়ে কুর্নিশ করলো। —নিশ্চয় থাকবেন সাহাব, আলবত থাকবেন। যে ক'দিন থাকবেন, গোলাম পাহারা দেবে। হাজার হোক, আপনাদের পক্ষে বিদেশ-বিভুঁই।

ভালই হলো। একটা পাহারাদার থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত। বিদেশে যখন এসেছি, চুপচাপ বাড়িতে তো আর বসে থাকবো না। ঘুরে ঘুরে বেড়াবো।

তোমার নাম কি?

বান্দার নাম আবদুল রিজভী।

তোমাকে কেউ চেনে এখানে?

লোকটার দুটো চোখ দপদপ করে জ্বলে উঠলো।

দেখবেন হুজুর? এই দেখুন!

আধময়লা কুর্তার মধ্য থেকে আবদুল প্রায় শতছিন্ন গোটা কয়েক কাগজ বের করলো। কাগজগুলো হলদে হয়ে গেছে। গোটা তিনেক অভিজ্ঞানপত্র। বড় বড় লোকের লেখা। ফৈজাবাদের জমিদার, অযোধ্যার নবাবের ভাইপো, গোণ্ডার রহিম, সবাই লিখেছে, আবদুল রিজভীর মতন বিশ্বাসী, কর্তব্যপরায়ণ, সৎলোক দুর্লভ।

ঠিক আছে, তোমাকে রাখবো। কত দিতে হবে বলো?

আমি একলা মানুষ খোদাবন্দ, যা দেবেন তাতেই রাজী!

আবদুল রয়ে গেল। দিন তিনেক খুব ভালভাবে কাটলো। বেড়িয়ে যখনই ফিরতাম, দেখতাম, সদর দরজার পাশে আবদুল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। সজাগ প্রহরী। আমাদের দেখলে কপালে হাত

ঠুকে সেলাম করতো। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে শুনতে পেতাম খটখট জুতোর শব্দ। বাইরে আবদুল পাহারা দিচ্ছে।

কিন্তু তিন দিন পর রাত্রে ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছি, হঠাৎ মনে হলো, আমার খাটটা যেন নড়ে উঠলো। চমকে খাটের উপরে উঠে বসলাম। ভাবলাম, নির্ঘাৎ ভূমিকম্প। বাড়িতে বিজলী বাতি ছিল না। হ্যারিকেন ব্যবহার করতাম। আলো জ্বললে তোমার মেসোর ঘুম হয় না বলে শোবার আগে হ্যারিকেন নিভিয়ে দিতাম। কিন্তু মাথার বালিশের নীচে টর্চ থাকতো। তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বাললাম। দেখলাম, তোমার মেসোর খাট ঠিক জায়গাতেই রয়েছে। আমার খাটটা হাত দশেক সরে এসেছে!

ভূমিকম্পে তো এমন হবার কথা নয়!

গলা দিয়ে স্বর বের হচ্ছিল না। কোন রকমে চাপা গলায় তোমার মেসোকে ডাকলাম।

বার কয়েক ডাকার পর তোমার মেসো উঠে বসলো।

কি, কি হলো?

কি হয়েছে বলতে হলো না। খাটের অবস্থান দেখে সবই বুঝতে পারলো।

ওখানে গেলে কি করে?

তাই তো ভাবছি। কে যেন আমার খাটটা সরিয়ে নিয়ে এলো!

তোমার মেসো ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলো, তারপর বললো, বুঝতে পেরেছি। তোমার রোগ তো একটা নয়। ঘুমিয়ে কথা বল, ঘুমাতে ঘুমাতে শিবপুরের বাড়িতে একবার বারান্দা পর্যন্ত হেঁটে চলে গিয়েছিলে, মনে আছে? সেই রকম খাটটা ধরেই হয়তো হাঁটতে শুরু করেছো। দাঁড়াও, খাটটা ঠিক জায়গায় সরিয়ে দিই।

তোমার মেসো খাট থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলো।

আমি আমার খাটের ওপর বসে! সরসর করে খাটটা সরে পুরানো জায়গায় চলে গেল। ভয়ে হাত কেঁপে টর্চটা নিভে গিয়েছিল। অন্ধকারে শুধু আমার আর্তকণ্ঠ শোনা গেল। তোমার মেসো উঠে হ্যারিকেন জ্বালালো। তারপর সারাটা রাত দু'জনে চুপচাপ বসে। একবার তোমার মেসো দরজা খুলে বাইরে গিয়ে ডাকলো,—আবদুল!

হুজুর!

উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে আবদুল এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল।

ফরমাইয়ে সাহাব!

কিন্তু ব্যাপারটা এমন অলৌকিক, অবিশ্বাস্য যে কাউকে বলাও যায় না।

যাকে বলবো সেই ভাববে আমাদের মাথার দোষ আছে। তাই চুপচাপ রইলাম।

আমাদের দু'জনের কেউই ভূতে বিশ্বাস করতাম না। চিরকাল দু'জনে শহরে মানুষ। ভূতের কথা গল্পে পড়েছি, কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি।

রাতের ব্যাপারটা আমাদের দু'জনকেই রী

আবার সরে আসতে দেখে কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিল না।

দিন পনেরো নির্বিবাদে কাটলো। কোন উপদ্রব নয়। এক সময় আমার নিজেরই মনে হলো, সব ব্যাপারটাই হয়তো মনের ভুল! সিনেমা দেখে ফিরতে সেদিন একটু রাত হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে প্রায় বারটা হলো। শীত পড়তে শুরু হয়েছে। লক্ষ্ণৌতে শীতের প্রকোপ একটু বেশী। সব জানলাগুলো সন্ধ্যারাত থেকেই বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

হঠাৎ মাঝরাতে খটখট করে সব জানলাগুলো খুলে গেল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিলো। বন্ধ করার দোষ হলে একটা জানলা খুলে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু এভাবে একসঙ্গে শোবার ঘরের চারটে জানলা খুলে যায় কি করে!

তোমার মেসো 'খাটের ওপর উঠে বসলো! উঠেই আমাকে ধমক। —জানলাগুলোও কি ভাল করে বন্ধ করতে পারো না? মাঝরাতে আচ্ছা ঝামেলা!

তোমার মেসো উঠে সব জানলাগুলো টেনে বন্ধ করে দিলো।

মিনিট পাঁচেক।

তোমার মেসো এসে খাটে শোয়া মাত্র আবার খটখট করে জানলাগুলো খুলে গেল।

বার তিনেক এরকম হবার পর দু'জনেই একটু ভয় পেয়ে গেলাম। দরকার নেই বাপু শরীর সারিয়ে, এই ভূতুড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল।

কথাটা হঠাৎ আমার মনে হতে বললাম, আবদুলকে একবার ডাকলে হয় না।

আবদুল? আবদুল কি করবে?

আমরা যখন ঠিকমত জানলাগুলো বন্ধ করতে পারছি না, তখন ওকে দিয়ে একবার চেষ্টা করো। কথাটা বোধহয় তোমার মেসোর মনে লাগলো। দরজাটা খুলে ডাকলো, আবদুল।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো, হুজুর!

আশ্চর্য মনে হয়! আবদুল মানুষ না যন্ত্র!

আবদুল দরজায় এসে দাঁড়ালো।

জানলাগুলো কিছুতেই বন্ধ করতে পারছি না। একবার দেখো তো। আমি টর্চটা জ্বালিয়ে আবদুলের মুখের ওপর রেখেছিলাম। মনে হলো, আবদুলের দুটো চোখ জ্বলে উঠলো।

জি হুজুর!

আবদুল একটা একটা করে সব জানলাগুলো বন্ধ করে দিলো।

তারপর আবদুল আর এক মিনিট দাঁড়ালো না। সেলাম করে বাইরে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। না, জানলাগুলো আর খুলে গেল না।

তার মানে আমরা বোধহয় জানলাগুলো ঠিকমত বন্ধ করতে পারছিলাম না।

রাত্রে আর কোন অসুবিধা হলো না। সত্যি, কত মিথ্যা কারণে আমরা ভয় পাই। কত অল্পে।

পরের দিন দুপুরবেলা আবদুলকে দেখলাম। সাধারণতঃ দিনের বেলা সে নিজের ডেরায় চলে যায়। পাহারা দিতে আসে সন্ধ্যাবেলা। কিন্তু সেদিন দুপুরে বের হবার মুখে দেখলাম, আবদুল

চারদিকে ঘুরছে।

তোমার মেসো পোস্টাফিসে গিয়েছিল খাম, পোস্টকার্ড কিনতে। আশপাশে এমন কেউ নেই, যাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারি। চারদিকে বস্তি!

কি খুঁজছো আবদুল? আবদুল যেন একটু চমকে উঠলো।

আমার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখে বললো, একটা চিজ খুঁজছি মেমসায়েব! অনেকদিন আগে হারিয়েছিলাম, কিন্তু কোথায় হারিয়েছিলাম ঠিক মনে পড়ছে না।

উত্তর দিয়েই আবদুল আর দাঁড়ালো না। আস্তে আস্তে বস্তির দিকে এগিয়ে গেল!

ইচ্ছা ছিল, আবদুলকে তার পুরানো সংসার, তার পরিবারের লোকজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবো, কিন্তু সুযোগ পেলাম না।

কি খুঁজছে আবদুল ঠিকভাবে সে কথাও বললো না। কেমন একটা দুর্বোধ্য উত্তর দিয়ে গেল।

জানলাগুলো ভালভাবে দিনের আলোয় পরীক্ষা করে দেখলাম। কলকব্জার বিশেষ কোন কারসাজি নেই। অথচ রাত্রে কেন বন্ধ করতে পারলাম না।

দিনের বেলা কোন গোলমাল নেই, কিন্তু রাত হলেই যেন গা ছমছম করে। মনে হয়, আমি আর তোমার মেসো ছাড়া তৃতীয় আর এক সত্তার যেন আবির্ভাব হয়। তাকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে ধরা দেয়।

এই খাট সরানো, জানলাগুলো আচমকা খুলে যাওয়া এসব কিন্তু মোটেই স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

তোমার মেসো ফিরে আসতে আবদুলের জিনিস খোঁজার কথাটা বললাম, কিন্তু কথাটার ওপর সে একেবারেই গুরুত্ব আরোপ করলো না। বললেন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন মানে হয় না। হয়তো পকেট থেকে কিছু পড়ে গেছে, তাই খুঁজছিল।

আমি কিন্তু মনের কথাটা বলেই ফেললাম। —জান, আর এখানে ভাল লাগছে না!

কেন, তোমার শরীরের তো উন্নতিই হয়েছে। পেটের ব্যথাটা আর নেই। খিদেও হচ্ছে।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, এ বাড়িটা আমার ভাল লাগছে না।

কেন, বাড়ির কি দোষ হলো?

কি দোষ তো তুমি জান।

ওসব তোমার মনের ভুল। আমি ওসব মোটেই ভাবছি না।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই ভাববার যথেষ্ট কারণ ঘটলো। তোমার মেসো আর আমার দু'জনেরই।

সেদিন বিকাল থেকেই বৃষ্টি আরম্ভ হলো। অসময়ের বৃষ্টি। বুঝতে পারলাম, এই বৃষ্টির পরই শীতের প্রচণ্ডতা বাড়বে। দুটো বিলাতী কম্বল ছিল। তাতে সে শীত আটকাবে না।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো ঘরের মধ্যে খুটখুট শব্দ। কে যেন বুট পরে পায়চারি করছে। একদিক থেকে আর একদিক।

উঠে বসলাম। তোমার মেসো ঘুমে অচেতন।

টর্চ জ্বালিয়ে ঘরের এদিক-ওদিক ফেললাম। কেউ কোথাও নেই। অথচ খুটখুট শব্দ সমানে শোনা গেল। ইঁদুরের উৎপাত কিনা কে জানে! আমাদের গড়পারের বাড়িতে বিরাট সাইজের সব ইঁদুর ঘুরে বেড়াতো। সাইজে বিড়ালের চেয়েও বড়! বাথরুমে যাওয়া দরকার। সাহস করে উঠলাম। বাথরুমের দরজা খুলে টর্চ জ্বেলে আগে এধার-ওধার দেখে নিলাম। কোণের দিকে আলো পড়তেই চিৎকার করে উঠলাম।

একেবারে দেয়াল ঘেঁষে একটি নর-কঙ্কাল। বললে বিশ্বাস করবে না, জীবন্ত নরকঙ্কাল। দুটো হাত প্রসারিত করে আমাকে ডাকছে। শুধু ডাকা নয়, খল-খল করে হাসি। অদ্ভুত মারাত্মক হাসি। তার শব্দে শরীরের সমস্ত রক্ত পলকে যেন জমাট বেঁধে যায়।

আর আমার জ্ঞান ছিল না। বাথরুমের দরজার কাছে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। যখন জ্ঞান হলো দেখলাম, খাটের ওপর শুয়ে আছি। সকাল হয়েছে। তোমার মেসো উদ্বিগ্নমুখে পাশে বসে।

একটু পরেই মেসো বললো, কি হয়েছিল?

কি হয়েছিল বললাম।

মেসো বললো, কি আশ্চর্য, কাল রাত থেকে কতবার যে আবদুলকে ডেকেছি, ডাক্তারের কাছে পাঠাব বলে, কিন্তু সে নিখোঁজ। পাশের বস্তির এক ছোকরাকে ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছি।

একটু পরেই বাইরে মোটরের শব্দ হলো। বৃদ্ধ বাঙালী ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন।

সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমরা আপনার দাদুকে এ জমিতে বাড়ি করতে অনেক বারণ করেছিলাম। তিনি শোনেনি।

কেন, এ জমিতে কি আছে?

একটা কবর ছিল। কবরের ওপর কেউ বাড়ি করে না। আপনার দাদুও এ বাড়িতে বেশিদিন টিকতে পারেননি!

আরো একটা কথা, আবদুল বলে একটা লোক পাহারা দিতো, তাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আবদুল? পুরো নাম কি?

আবদুল রিজভী।

ডাক্তার নাম শুনে চমকে উঠলেন। সে কি! এখানে আবদুল রিজভীরই তো কবর ছিল। সে মারা গেছে আজ আশি বছরের ওপর।

কিন্তু সে যে অনেকগুলো সার্টিফিকেট ।

ডাক্তার হাসলেন, তার তারিখগুলো দেখেছেন? কবেকার লেখা!

পরের দিনই আমরা কলকাতা ফিরে এসেছিলাম।

এখনও মাঝে মাঝে ভাবি। দুটো প্রশ্নের উত্তর পাই না। ঘুরে ঘুরে কি খুঁজছিল আবদুল রিজভী! নিজের কবর? আর সে রাতে ওভাবে বাথরুমে কঙ্কাল-মূর্তি কেন দেখালো? আমাদের তাড়াবার জন্যই কি?

আরণ্যক

যুক্তির আতস কাঁচ দিয়ে সবকিছুর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন আছে, তেমনি আছে অতীন্দ্রিয় জগৎ। সে জগতে সবকিছু বিচিত্র, সবকিছু যুক্তির মাধ্যমে যাচাই করা চলে না। এই অতি-প্রাকৃত জগৎকে গায়ের জোরে অস্বীকার যারা করে, তারা পৃথিবীর বারো আনা রহস্যের খোঁজ পায় না।

অনেক সময় আমরা মনকে বোঝাই, এসব চোখের ভুল, মনের ভুল, যা ঘটেছে নিছক কল্পনা অথবা মনের তৈরি মায়া, কিন্তু সঙ্গোপনে নিজের মনের মুখোমুখি যখন বসি, তখন এসব অবজ্ঞা করা দুরূহ হয়ে ওঠে।

ভণিতা ছেড়ে আসল ঘটনার কথা বলি।

রায়পুর থেকে ছত্রিশ মাইল পশ্চিমে। আধা-শহর। নাম খুরশীদগড়। আধা-শহর বলছি এই জন্য, পাকা রাস্তা আছে, গোটা কয়েক অফিস, একটা পেট্রোল পাম্প, মোটরের কারখানা। পাকা রাস্তার পরিধি পার হলেই নিবিড় জঙ্গল। ছোট ছোট টিলা। কিছুটা অঞ্চল সংরক্ষিত। সরকারী বনবিভাগের।

প্রথম এসেছিলাম বছর দশেক আগে। এক টিম্বার কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে।

কাজ বিশেষ কিছু নয়। জঙ্গল থেকে কাটা কাঠের হিসাব রাখতে হত। দুজন কর্মচারি, মাসান্তে

তাদের মাইনে দেওয়া। অবসর সময়ে শিকার।

শিকারের হাতেখড়ি হয়েছিল উড়িষ্যার জঙ্গলে। বাবা সেখানে বনবিভাগে ছিলেন। জরিপের কাজ। তিনিই হাতে করে শিকার শিখিয়েছিলেন। প্রথমে সম্বর, অ্যান্টিলোপ, তারপর অন্য বরাহ; শেষকালে লেপার্ড।

নিজের দক্ষতার ওপর বেশ আস্থা হয়েছিল। এদিক ওদিক থেকে শিকারের জন্য ডাকও আসত।

তারপর খুরশীদগড়ে আবার যখন এলাম, তখন আমার পদোন্নতি হয়েছে। এক বিশ্বজোড়া পেট্রোল কোম্পানির আমি ভ্রাম্যমান পরিদর্শক।

বড় শহর বদলায়। তার রাস্তাঘাট, বাড়ি-বাগানে কয়েক বছর অন্তর নতুন রূপ পাল্টায়। কিন্তু খুরশীদগড়ের মতন আধা-শহর শতাব্দীর পর শতাব্দী একরকম থাকে।

পুরনো বাসিন্দারা এসে ঘিরে ধরল। কুশল প্রশ্ন, নিমন্ত্রণের হিড়িক। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প গুজব। আড্ডা ভাঙবার মুখে আদিবাসীর দল এসে দাঁড়াল।

খালি গা, পরনে নেংটি, চুলে পালক গোঁজা। কারো কারো হাতে টাঙ্গি আর বর্শা।

এদের বাস জঙ্গলের মধ্যে ঝর্নার ধারে। রাস্তা তৈরির কাজ করে। মেয়ে পুরুষ দুজনেই।

সারা বছর এ কাজ থাকে না, বিশেষ করে বর্ষাকালে। তখন এরা জঙ্গল সাফ করে চাষবাস করে হরিণ কিংবা পাখি শিকার করে আগুনে ঝলসে খায়।

বাবু তুই এসেছিস—এবার বাঁচা। মনে হল চেনা লোক। দশ বছর আগে আমাকে দেখেছে।

মুখ তুলে দেখলাম, ঠিক তাই মোড়ল কথা বলছে। চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু পেশী এখনো সতেজ। টান টান চেহারা।

আগের বার বাঁচিয়েছিলি।

এর আগে একবার চিতার উপদ্রব হয়েছিল। এদের ছাগল, মুরগি তুলে নিয়ে যেত। একবার উঠোনে তেল মাখিয়ে একটা বাচ্চাকে রোদে শুইয়ে রেখেছিল, দিন-দুপুরে চিতা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিয়ে উধাও। এক বুড়ো কাছে বসে পাহারা দিচ্ছিল। সে মুহূর্তের জন্য দেখল, একটা হলুদ ঝিলিক উঠানের ওপর পড়েই আবার মিলিয়ে গেল। সেই সময় এরা দল বেঁধে এসেছিল।

বাবু, তোর বন্দুক নিয়ে একবার চল। আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে।

গিয়েছিলাম।

চিতা শিকার সহজ নয়। বন্দুক হাতে সব সময় সজাগ থাকতে হয়। চিতার থাবার তলায় ডানলোপিলোর প্যাডিং। পাশ দিয়ে গেলেও শব্দ পাওয়া যায় না। তাছাড়া এরা গাছে উঠতেও দক্ষ। যে গাছের তলায় শিকারী বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে আছে, চিতা হয়তো ওঁৎ পেতে রয়েছে সেই গাছেরই ডালে। সুযোগ বুঝে শিকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

প্রথমত একটা 'কিল' রাখা হল।

ঝর্নার ধারে একটা ঝোপের পাশে মরা মোরগ।

আমি কাছেই একটা গাছের ডালে বসে রইলাম। একদিন, দুদিন গেল, কিছু হল না।

অথচ ঝোপের মধ্যে চিতার ল্যাজ আচড়ানোর শব্দ কানে এল। বার দুয়েক পাতার ফাঁকে তার জ্বলন্ত দুটি চোখও দৃষ্টিগোচর হল। কিন্তু চিতা বাইরে এল না।

সম্ভবত সে বাতাসে মানুষের গন্ধ পেয়ে থাকবে। বুঝলাম, এবারে তাকে কাবু করা যাবে না।

আদিবাসীদের বললাম, তোমরা এক কাজ কর, তিনদিক থেকে ঝোপটা পেটাতে শুরু কর। তাহলেই চিতা বের হয়ে পড়বে। ফাঁকা দিয়ে আমি তৈরি থাকব বন্দুক নিয়ে। বের হলেই গুলি চালাব। এতে বিপদের সম্ভাবনাও যথেষ্ট। মরিয়া চিতা লোকেদের ঘাড়ের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যার ওপর পড়বে তার নিস্তার নেই। কিন্তু শিকারে কিছু বিপদের সম্ভাবনা থাকেই।

ঝোপের একটা দিকে ঝর্না। ঝর্না এখানে অনেক নিচে। ঝুঁকে পড়লে তবে তার উচ্ছল জলস্রোত দেখা যায়। ঢালু পাড় জঙ্গলে সমাকীর্ণ। সেদিকে বন্দুক তাক করে আমি বসলাম।

এদিকে লোকেরা টিন আর ক্যানেস্তারা পিটতে লাগল। অত্যুৎসাহী দু-একজন কাপড়ের বলে পেট্রোল মাখিয়ে তাতে আগুন জ্বেলে ঝোপের মধ্যে ফেলতে শুরু করল।

কাজ হল। ঝোপের অন্তরাল থেকে চিতার ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল।

প্রায় ঘণ্টা কয়েক পর। ঝোপের মধ্যে একটা তীব্র আলোড়ন। চিতাটা লাফিয়ে শূন্যে উঠল।

পরিষ্কার দিনের আলো। আকাশে ছিঁটেফোঁটা মেঘ নেই।

হলুদ রঙের একটা বলের আকার। চিতা নিজের শরীরটা গুটিয়ে নিয়েছে। কাচের মার্বেলের মতন জ্বলছে দুটো চোখ। বড় বড় দাঁতের ফাঁক দিয়ে লাল টকটকে জিভটা বেরিয়ে পড়েছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করলাম। পর পর দুটো। প্রথমটা পিছনের পায়ের ওপর লাগল। দ্বিতীয়টা চোয়ালে। চোয়াল ভেঙে যাবার শব্দ হল। শূন্যেই ডিগবাজী দিয়ে চিতাটা নিচের ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। তার প্রাণে বেঁচে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। চোয়াল গুঁড়িয়ে যেতে নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু আপশোষ হল, শিকার হাতের মুঠোয় এল না।

খুব অল্প সময়, তবু তার মধ্যে নজর এড়ায়নি। চিতার একটা কান নেই। সম্ভবত বনেবাদাড়ে ঘোরার সময় কাঁটাগাছে লেগে কানটা কেটে গেছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আরও বিস্ময়কর।

চিতার দেহের একপাশে কোন দাগ নেই। ধূসর বর্ণ। পরে দু-একজন পশুতত্ত্ববিদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করেছি। তারা কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি।

চিতাটা যে মারা গিয়েছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার আরও একটা কারণ ছিল।

তারপর থেকে আর কোনরকম উপদ্রব হয়নি।

দশ বছর পরে আবার সেই উপদ্রব।

বাঁচা বাবু, বাঁচা। সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে।

পিছনে দাঁড়ানো একজন মোড়লের কথার প্রতিবাদ করল।

একি বাঘ যে বাবু বন্দুকে টোটা ভরে মারবে, আর বাঘ খতম। এতো পিরেত বাঘের রূপ ধরে এসেছে।

শুনলাম, কোন মন্তব্য করলাম না।

আদিবাসীদের জগতে ভূতপ্রেতের অবাধ রাজত্ব। হঠাৎ ঝড়ে গাছ পড়ে গেলে সেও অপদেবতার কাণ্ড, আবার গভীর রাত্রে শকুনি শাবকের করুণ কান্নাও প্রেতের কারসাজি।

যা হোক, ঠিক করলাম, পরের দিনই শিকারে বের হব।

মোড়লকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলাম।

চিতার গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষরূপে ওয়াকিবহাল হবার জন্য।

পরের দিন সকালে খাটিয়ায় বসে চা পান করছি, মোড়ল এসে দাঁড়াল।

কি খবর বল?

খবর আর কি বলব বাবু। কাল মোমিন যা বলেছে, কথাটা মিথ্যা নয়।

মোমিন কে? আর সে কি বলেছে?

মোমিন আমার ভাইয়ের ছেলে। সে যে বলেছে, চিতা নয় অপদেবতা, ঠিকই বলেছে।

কেন?

তাকে শিকার করা যায় না। মাস ছয়েক আগে বন বিভাগের এক সাহেব এসেছিল। দশ দিন ধরে নাজেহাল। এই দেখল চিতা সামনের এক গাছের আড়ালে, বন্দুক ছুঁড়ল, ব্যাস, কোথাও কিছু নেই। একটু পরেই দেখল চিতা পিছনের পাথরের এক ঢিবির পাশে।

শেষকালে সাহেব বন্দুক কাঁধে নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। স্বীকার করেছিল, চিতা নয়, ভৌতিক কিছু একটা।

হেসে বললাম, সাহেব শিকারে যাবার আগে ক' গ্লাস সরাব টেনে নিতেন, সে হিসাব রাখ মোড়ল? শুধু সামনে পিছনে কেন, তেমন হলে চারপাশে চারটে চিতা দেখতে পেত।

আমার রসিকতায় মোড়ল হাসল না।

মোড়লের কাছে শুনলাম, নদীর ওপারে বনের মধ্যে চিতার আস্তানা।

সময় সুযোগ বুঝে সে নদী সাঁতরে এপারে চলে আসে।

দুপুরে যখন এপারের মাঠে আদিবাসী ছেলেরা গরু, ছাগল, চরাতে আসে, তখন তাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে চিতা ছোট সাইজের গরু কিংবা ছাগলের ওপর লাফিয়ে পড়ে। তারপর আধমরা শিকার পিঠে নিয়ে অক্লেশে নদী পার হয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে যায়।

কোন কোনদিন এপারের জঙ্গলের মধ্যে বসেও আহার শেষ করে। একটা বেপরোয়া ভাব, অকুতোভয়, অসমসাহসিক।

পীতবর্ণের এই অগ্নিশিখা আশপাশের সকলের আতঙ্ক।

আমি বললাম ঠিক আছে, আজ দুপুরবেলা গাছের ডালে বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা করব, ঠিক গোচারণ ভূমির পাশে। হয়তো কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু এছাড়া আর পথ দেখছি না।

খাওয়াদাওয়ার পর খাঁকি সার্ট আর হাফ প্যান্ট পরে তৈরি হচ্ছি, এল গোকুলপ্রসাদ।

আমি যে পেট্রোল কোম্পানির প্রতিনিধি, গোকুল প্রসাদ সেই কোম্পানির এখানকার ডিস্ট্রিবিউটর।

আমাকে দেখে বলল, একি, রণসাজে কোথায়? অবশ্য কিপা নদীর ধারে হরিয়াল আর তিতিরের ঝাঁক নামে এই সময়।

পাখি নয় গোকুল, চিতা শিকারে।

দৃশ্যতঃ গোকুল প্রসাদের মুখের রঙ বদলাল। সে গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, জঙ্গলে যে চিতা অত্যাচার করছে, সেটা নাকি?

হ্যাঁ, আদিবাসীর দল এসেছিল। সেই চিতার কথাই বলল।

সর্বনাশ, ও কাজ করবেন না। গোকুল প্রসাদের কণ্ঠে আতঙ্কের স্পর্শ।

কেন?

ওটা চিতা নয়, অশরীরী কিছু।

উচ্চহাস্য করে উঠলাম। জানতাম, গোকুল প্রসাদ কখনো নেশা ভাং করে না। জীবনে বিড়ি সিগারেটও খায়নি। কাজেই নেশার ঘোরে কিছু দেখবে এমন সম্ভাবনা কম।

তবে গোকুল প্রসাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বছর খানেক আগে। তখনো পর্যন্ত সে অকলঙ্ক চরিত্র ছিল। বছর খানেকের মধ্যে যদি নেশার দাস হয়ে থাকে তো বলতে পারব না।

তাই প্রশ্ন করলাম, কি ব্যাপার বল তো?

গোকুল প্রসাদ খাটিয়ার ওপর চেপে বসল।

দিন পনেরো আগে আমি রায়পুর থেকে ফিরছিলাম। চাচার বাড়ি থেকে। বের হতে দেরী হয়ে গেল। মাঝপথে সন্ধ্যা নামল। আমি গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম। জঙ্গলের পাশের রাস্তায় এসেছি, দেখি ঝোপের ধারে একটা চিতা। বসে বসে নিজের থাবা চাটছে। মোটরের হেড লাইটে তার দুটো চোখ সবুজ মার্বেলের মতন জ্বলে উঠল।

আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে কোন হাতিয়ার নেই। চিতা যদি মোটরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলেই বিপদ।

মরিয়া হয়ে অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিলাম। স্পীডো মিটারের কাঁটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। মোটর বাতাসের বেগে উড়ে চলে গেল।

মাইল দুয়েক গিয়ে মোটরের গতি কমালাম। বাঁক ঘুরতেই এক দৃশ্য। ঝোপের কাছে বসে চিতাটা থাবা চাটছে।

আমি হেসে অভয় দিলাম তোমার কি ধারণা এত বড় জঙ্গলে চিতা মাত্র একটি-ই? আর নেই?

গোকুল প্রসাদ মানতে চাইল না।

কিন্তু এক চিতা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। এক সহিত, এক বসার ভঙ্গি। পরপর চারবার এক দৃশ্য দেখলাম?

আমি আর কিছু বললাম না।

এ দেশে সিদ্ধিপান নেশার মধ্যে পরিগণিত হয় না। খুব সম্ভব চাচার বাড়িতে গোকুল প্রসাদ

সিদ্ধির সরবৎ পান করে থাকবে। তারই কল্যাণে রাস্তার দু-পাশে কেবল চিতাই দেখেছে।

একটু বসে গোকুল প্রসাদ চলে গেল। তারপরই মোড়ল এল।

আমি তৈরিই ছিলাম; মোড়লের সঙ্গে বের হয়ে পড়লাম।

এবার 'কিল' কি হবে? পথে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম।

একটা ছাগলের বাচ্চা এনেছি। সেটাকে গাছের তলায় বেঁধে রাখব। তুই মাচা বেঁধে গাছের ডালে বসবি।

এমন ব্যবস্থায় সন্দেহ প্রকাশ করলাম।

কিন্তু চিতার পক্ষে গাছে ওঠা মোটেই অসুবিধাজনক নয়।

মোড়ল বলল, সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তুই গাছে উঠে গেলে তলার জঙ্গল থেকে কাঁটাগাছ এনে তলায় রেখে দেব। কাঁটাগাছ দেখলে বাঘ সেদিকে ঘেঁষে না।

আয়োজন অবশ্য ভালই , কিন্তু কোন কারণে বিপদের সম্মুখীন হলে দ্রুত গাছ থেকে অবতরণ করার পথ বন্ধ।

আমি শুধু মোড়লকে জিজ্ঞাসা করলাম, যে গাছে মাচা বাঁধা হবে তার আশপাশে অন্য গাছ আছে?

মোড়ল মাথা নাড়ল : না।

আমার এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য, চিতাটা পাশের কোন গাছে উঠে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে কিনা?

যখন মাচার কাছে গিয়ে পৌছলাম, তখন দুপুরের রোদ স্তিমিত। এমনিতেই ঘন অরণ্যের সঙ্গে সূর্যালোকের প্রবেশ নিষেধ।

জনচারেক লোক অপেক্ষা করছিল। একজনের হাতে দড়িতে বাঁধা ছাগলছানা। সেটার পরিত্রাহি চিৎকারে অরণ্য মুখরিত।

আমি ভেবেছিলাম আমার সঙ্গে কেউ একজন মাথায় থাকবে, কিন্তু, কার্যকালে দেখা গেল কেউ থাকতে রাজী নয়।

এমনকি মোড়লেরও বাড়িতে মেয়ের অসুখ। তবে যাবার সময় মোড়ল আশ্বাস দিয়ে গেল, আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না, ছাগলছানার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে চিতাটা শীঘ্রই দেখা দেবে।

তাছাড়া, এই সময় বনের জন্তুরা অনেকেই নদীতে জলপান করতে আসে।

অতএব গাছে হেলান দিয়ে বন্দুক কোলে নিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রোদের তেজ ম্লান হয়ে এল। গাছের ছায়া দীর্ঘতর। দু-একটা মেটে রঙের খরগোশ ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। পাখিরা কুলায় ফিরল তাদের অপূর্ব কাকলিতে অরণ্যের নীরবতা খানখান হয়ে গেল।

সন্ধ্যা নামল। ঝোপে ঝোপে জোনাকির ঝাঁক। দূরে দু-একটা ময়ূরের ডাক শোনা গেল। কিন্তু

চিতার দেখা নেই।

আরও আশ্চর্য; ছাগলছানা নির্ভয়ে ঘুমোচ্ছে। কোনদিক থেকে কোন উপদ্রব হতে পারে, এমন চিন্তা তার নেই।

কাগজে মোড়া খাবার আর ফ্লাস্ক থেকে জল পান করলাম। বুঝতে পারলাম, সারাটা রাত এই রকম ত্রিশঙ্কুর মতন কাটাতে হবে।

এই সময়ে গাছ থেকে নেমে ফেরার চেষ্টা বাতুলতা।

একটু বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, নিশাচর পাখির কর্কশ কণ্ঠস্বরে তন্দ্রা ভেঙে গেল।

ছাগলছানা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঝোপের পাশে দুটি জ্বলন্ত দৃষ্টি।

বুঝতে পারলাম চিতা ঝোপের মধ্যে অপেক্ষা করছে। সুযোগ বুঝে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এখন আর অন্ধকার নেই। চাঁদের অমল জ্যোস্নায় বনভূমি যেন স্নান করে উঠেছে। আমি যেদিকে বসে আছি, সেদিকটা অন্ধকার, ঘন পাতার রাশির জন্য, কিন্তু গোচারণভূমি, নদীর পাড়, ছোট ছোট ঝোপ সব দুগ্ধ বল।

ঝোপটা নড়ে উঠল। আমি বন্দুক নিয়ে তৈরিই ছিলাম!

চিতা সন্তর্পণে ঝোপ থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল।

চিতাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কোথাও একটা অন্ধকার নেই।

আমি এক ঝলক দেখেই চমকে উঠলাম। একটা কান কাটা। শরীরের একদিকে কোন দাগ নেই। ধূসর বর্ণ।

তার অর্থ, বছর দশেক আগে যে চিতাকে গুলি করে হত্যা করেছিলাম, পরলোক থেকে সেই চিতা ফিরে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য মুহূর্তের জন্য এমন একটা চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, তারপরই মনকে বোঝাতে শুরু করলাম। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে।

কাঁটা ঝোপের আঘাতে যে কোন জন্তুরই কান কাটা যেতে পারে। এর মধ্যে আশ্চর্যজনক কিছু নেই। বিশেষকরে সিংহ, বাঘ, চিতা যারা শিকার ধরবার আগে গুড়ি মেরে চলে।

আর দেহের কিছুটা ধূসর হওয়াও বিচিত্র নয়। কে জানে, সামনে দাঁড়ান চিতাটা দশ বছর আগে নিহত চিতার বংশোদ্ভূত কিনা।

চিতার গন্ধে ছাগলছানা জেগে উঠেছে। শুধু জেগে ওঠা ভয় বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে।

তারস্বরে চিৎকার করছে আর রজ্জুমুক্ত হবার প্রাণপণ চেষ্টা।

আশ্চর্য, চিতার লক্ষ্য কিন্তু ছাগলছানা নয়। সে একদৃষ্টে আমার দিকে দেখছে। দুটি চোখে প্রতিহিংসা বিচ্ছুরিত।

একটু চিন্তায় পড়লাম। কিছু বলা যায় না। যে ডালে আমি বসে আছি সেটা এমন কিছু উঁচুতে নয়। দু-একবার চেষ্টা করলে নাগাল পেয়ে যেতে পারে।

তারপর দুজনে গড়াগড়ি করে কাঁটার স্তূপের ওপর পড়ব।

বন্দুক ঠিক করে বসে রইলাম।

চিতা শূন্যে লাফ দিলেই ট্রিগার টিপব। দোনলা বন্দুক। প্রয়োজন হলে দ্বিতীয় গুলিও ছুঁড়তে হবে। ঠিক তাই।

চিতাটা নিচু হয়ে মাটির সঙ্গে নিজেকে প্রায় মিশিয়ে দিল। প্রবলবেগে ল্যাজটা আছড়াচ্ছে। ল্যাজের ঝাপটায় শুকনো পাতার স্তূপ ইতস্ততঃ উড়তে লাগল। দৃষ্টি কিন্তু আমার দিকে।

কয়েক মুহূর্ত, তারপরই চিতা লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়লাম।

ঠিক পাঁজরে গিয়ে লাগল। শূন্যেই মুখ বিকৃত করে চিতাটা পাক দিয়ে সশব্দে মাটির ওপর পড়ল।

চারপা প্রসারিত করে মরণযন্ত্রণায় সমস্ত শরীরটা বার কয়েক কুঞ্চিত করল, তারপর স্থির হয়ে গেল।

এখন নামা বিপদজনক। তাছাড়া আমার নামার উপায়ও ছিল না। তলায় কাঁটার স্তূপ।

অনেক শিকার কাহিনীতে পড়েছি, বাঘ নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে, মৃতের ভান করে। উৎফুল্ল শিকারী কাছে গেলে, তার প্রচণ্ড থাবার আঘাতে কিংবা দংশনে প্রাণ হারায়।

ঠিক করলাম, সারাটা রাত গাছের ওপরই থাকব। যা কিছু করার, ভোরের আলো ফুটলে করাই সমীচীন হবে।

কোমরের বেল্ট খুলে নিজেকে গাছের ডালের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধলাম। নিদ্রার ঘোরে ছিটকে নিচে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

নির্মেঘ আকাশ। সবকিছু দিনের মতন পরিষ্কার। চিতার দিকে দেখতে দেখতে চমকে উঠলাম।

স্পষ্ট দেখেছিলাম আমার গুলি তার পাঁজর বিদ্ধ করেছিল, কিন্তু চোয়াল বেয়ে টাটকা রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে।

দশ বছর আগে ঠিক যেখানে গুলি লেগেছিল। পাঁজর আর চোয়ালের দূরত্ব অনেকটা। গুলি পিছলে চোয়ালে লাগবে, তা সম্ভব নয়।

আশ্চর্য কাণ্ড। এই প্রথম শরীরে একটা শিহরণ অনুভব করলাম। অরণ্যে অন্য সব শব্দ যাদুমন্ত্রে যেন থেমে গেল। এমন কি ঝিঁঝির ডাকও।

এক সময়ে নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলাম।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন ভোর হয়ে গেছে। চারদিকে পাখির স্বর শোনা যাচ্ছে।

সামনের দিকে চেয়েই চমকে উঠলাম। কোথাও চিতা নেই। অথচ ছাগলছানাও উধাও।

অলৌকিক ব্যাপার। গাছ থেকে অনেক কষ্টে নেমে পড়লাম। কাঁটায় দু-এক জায়গায় ছিঁড়ে গেল।

কাছে গিয়ে ভাল করে দেখলাম। রক্তের সামান্য দাগও নেই। ছাগলছানা যে দড়িতে বাঁধা ছিল, তাও নেই। খুঁটিটাও নিখোঁজ।

তাহলে কাল রাতে সব কিছু কি স্বপ্নে ঘটেছিল? তা কি সম্ভব।

নিজের বন্দুক পরীক্ষা করে দেখলাম। দুটো গুলিই রয়েছে। গুলি ছোঁড়া হয়েছিল তার কোন প্রমাণ নেই।

একটু পরেই আদিবাসীরা এসে জড়ো হবে। কি বলব তাদের? আমার কাহিনী তাদের চিতার সম্বন্ধে অলৌকিকত্বই প্রমাণ করবে।

ছাগলছানাটাও নেই। তার অর্থ চিতা এসেছিল।

আমার পরাজয়ের কাহিনী আদিবাসীদের কাছে রটে যাওয়ার চেয়েও নিঃশব্দে আত্মগোপন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চলতে শুরু করলাম।

একটু চলতেই মনে হল পিছনে কে যেন আমাকে সন্তর্পণে অনুসরণ করছে। পিছন ফিরে দেখেই থমকে দাঁড়ালাম। চলার শক্তিও কে যেন হরণ করে নিল।

গাছের আড়ালে সেই চাতা। দুটি চোখে আগুনের ঝলক। চোয়াল আর পাঁজরে রক্তক্ষত।

আহত চিতা কি আমাকে অনুসরণ করছে?

কিন্তু বন্দুকে গুলি দুটো যখন অটুট, তখন চিতা আহত হল কি করে?

বন্দুক তুললাম। মনে হল, ভোরের কুয়াশার মধ্যে চিতা যেন মিলিয়ে গেল।

একবার নয়, একদৃশ্য বার বার তিনবার।

কখনও সামনে, কখনও পাশে, কখনও পিছনে।

অগ্নিঝরা দৃষ্টি দিয়ে আমাকে জরিপ করতে করতে চিতা চলেছে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। বয়স হয়েছে। শিকার করার শক্তি আর নেশা কোনটাই নেই। প্রায় অবসর জীবনযাপন করছি।

মাঝে মাঝে রায়পুর অঞ্চলের বনবিভাগের কয়েকজন দেখা করতে আসে।

সকলের মুখেই এক কাহিনী শুনি।

কাটা কান আর রক্তাক্ত দেহ নিয়ে যে চিতাকে প্রায়ই রাত্রের অন্ধকারে দেখা যায়, তাকে বধ করা কোন শিকারীর পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

সকলেই বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছে, ওটা সাধারণ চিতা নয়। হয়তো চিতাই নয়, চিতার প্রেতাত্মা।

আমারও তাই মত।

কিন্তু আমার যুক্তিবাদী বন্ধুরা যাঁরা সবকিছু বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিতে চান, তাঁদের আমি কি করে বোঝাব।

অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্য যুক্তিনির্ভর নয়, বিশ্বাসনির্ভর।

লাল নিশানা

কচুপাতার ওপর ঘন মাকড়সার জাল। মাদার গাছের তলাটা ঝুপসী অন্ধকার। কচুরিপানা ঢাকা মজা ডোবাটার ওপর বাঁশঝাড়গুলো নুয়ে নুয়ে পড়েছে। দু-একটা বাঁশ জলের বুকও ছুঁয়েছে। ডোবাটার ধারে ধারে কলমীদামের জঙ্গল।

তিনদিন ধরে সমানে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। জুইফুলি বৃষ্টি নয়, একেবারে মুষলধারায়। জল পেয়ে মানগুলো দিব্যি লকলকিয়ে উঠেছে। পিঁপড়ের সার চলেছে ডিম মুখে নিয়ে। এখনও আকাশের মুখ অভিমানের মেঘে ভরা। মনে হচ্ছে, একটু নাড়া পেলেই বুঝি ঝরঝর করে বর্ষণ শুরু করবে। সন্ধ্যার অনেক আগেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে চারপাশে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে একটানা। ব্যাঙের গোঙানী মাঝে মাঝে। একটু পরেই জোনাকিরা বেরোবে আলোর পশরা নিয়ে।

বসে বসে থেকে শিবানীর আর ভাল লাগল না। উঠে পড়ল ঘাস বন থেকে। দুটো হাত মাথার ওপর তুলে একবার আড়মোড়া ভাঙল। ঝোপের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল। সদরের উঁচু পাঁচিলটা দেখা যাচ্ছে। সদরের দরজার কিছুটা। ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। টিমটিমে আলো। ভাল করে দেখাও যায় না।

এক হাতে ঘাসগুলো সরাতে সরাতে শিবানী আরো একটু এগিয়ে এল। ডোবার ঘাট বরাবর। ঘাট মানে শান বাঁধানো চাতাল নয়, নারকোলের গুঁড়ি ফেলা। গুঁড়িগুলো শ্যাওলায় সবুজ হয়ে

আছে। একটু পা পড়লে আর দেখতে হবে না। একেবারে কাদায় পুঁতে যাবে। ডোবার মতন জল ডোবাটায় নেই এই বর্ষাকালেও নয়।

খুব চেনা পথ। কতবার বাসনের গোছা নিয়ে বৌটি এই ডোবায় এসেছে। ঝি কামিনী না এলে বৌটিই আসত বাসন মাজতে। তা না হলে, আর কে আসবে। বুড়ি শাশুড়ী ভাল করে চোখে দেখতে পেতেন না। একটা চোখে ছানি পড়েছে। ওপর নীচে চলাফেরা করতেই মুস্কিল হ'ত।

ভাঙাচোরা বাড়ি। শ্বশুরের আমলের না মেরামত, না কলি ফেরানো। মেরামত করবেই বা কে? এই একটি মাত্র ছেলে। শিবরাত্রির সলতে। তেজও সলতেরই মতন। মিটমিটে আলো। পার্কিনশন কোম্পানীর একেবারে ঘনিষ্ঠ কেরানী। দুনিয়ার যত চিঠিপত্র এসে জমা হয়। সেগুলো খাতায় টুকে সেকশনে সেকশনে পাঠাতে হয়। মাইনে পঁচাশি, তার মধ্যে ট্রেনের মাছলী বাবদ যায় সাত টাকা। তার ওপর জলখাবারের ব্যাপার আছে। যেটুকু বাকি থাকে, তাতে তিনজনের গ্রাস আর আচ্ছাদন দুটো চলে না।

আর কিছু না থাক। নামের জোর আছে। নাম বাসব। চেহারা আর ঐশ্বর্য কোনটাতেই ইন্দ্রত্বের ছাপ নেই। কাজেই ও বাড়ি মেরামত করা বাসবের সাধ্য নয়। তিনটে লোকের ভরণপোষণ চলে না ভাল করে, অথচ শাশুড়ীর দিনরাত নাকে কাঁদুনির কামাই নেই। আর একটা বাড়তি প্রাণীর দরকার। আর একজন না হ'লে সংসার বেমানান।

প্রথম প্রথম বৌকে আড়ালে ডেকে শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করতেন। খোঁজখবর নিতেন নতুন অতিথির আসার সম্ভাবনাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতেন। বৌয়ের মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কপাল চাপড়াতেন।

এ হ'ল প্রথম পর্ব। গাব গাছে হেলান দিয়ে শিবানী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। দ্বিতীয় পর্বের অবস্থা আরো মারাত্মক। রাজ্যের শিকড় বাকড়, মাদুলী তাবিজ বৌয়ের হাতে উঠল। হাত নাড়াই দুষ্কর। প্রতিবাদ করা বৃথা।

গাঁয়ের কোন সাধু সন্ন্যাসী এসেছে খবর পেলেই শাশুড়ী টেনে নিয়ে যেতেন বৌকে। ছানির অস্পষ্টতা কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারত না।

কিন্তু তবু কিছু হল না। এবারেই অন্তিম পর্ব। সে পর্বের চেহারা দেখে বৌটি শিউরে উঠল। এতদিন শুধু শাশুড়ী পিছনে লেগে ছিলেন, এবার তাঁর ছেলেও তৎপর হয়ে উঠল।

চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকতে গিয়েই বৌটি চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘরের মধ্যে মা আর ছেলে তাকে নিয়েই আলোচনা চলেছে।

তুমি আর কি করবে মা, মাদুলী তাবিজ কত আর বাঁধবে হাতে? বৌ তোমার বাঁজা আমি কলকাতার ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করেছি।

ডাক্তার বন্ধু মানে লেজার সেকশনের পীতাম্বর মুখুটি। লেজারও লেখে আবার অবসর সময়ে হোমিওপ্যাথি করে। একেবারে অব্যর্থ। বড়বাবুর মেজছেলের নাকের ওপর বিশ্রী একটা আঁচিল গজাচ্ছিল; ক' ডোজ থুজায়ে সে আঁচিল নিশ্চিহ্ন হ'ল। নিবারণবাবুর শাশুড়ীর হাঁপানী যায়, যায়

অবস্থা, ছ ফোঁটা ডিজিটালিসে একেবারে অসাধ্য সাধন। ওষুধ পেটে পড়বার পরের দিনই সেই শাশুড়ী হাওড়া থেকে হেঁটে মেয়ের বাড়ি বালীতে গিয়ে উঠেছিলেন।

আলাপটা বাসব তাঁর সঙ্গেই করেছিল। পীতাম্বর মুখুটি বাসবের বৌয়ের চেহারার বর্ণনা, চলাফেরা, কথাবার্তার ধরণ সব শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর শুধু বলেছিলেন, ওই স্ত্রীর দ্বারা তোমার বংশ রক্ষা হবে না বাসু। তুমি অন্য পত্নী গ্রহণ কর। ক্ষুণ্ণ হবার কিছু নেই। এ বিষয়ে শাস্ত্রে বিধান আছে।

পীতাম্বর মুখুটি শাস্ত্রও আওড়েছিলেন। অফিসসুদ্ধ সবাই অবাক। এই একটা অসাধারণ লোক, লেজারের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। হানেমাতা, চন্দ্রশেখর, কালী, মহেশ ভট্টাচার্য, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ সব একেবারে নখদর্পণে। তামাম শ্লোক কণ্ঠস্থ। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হল। ডোবার কচুরিপানার পাতায় পাতায় টুপটাপ শব্দ। বাঁশের বনে ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ। সে সন্ধ্যায় বৌটি চায়ের কাপ সামলে ধীর পায়ে রান্নাঘরে ফিরে এসেছিল।

চা না পেয়ে কিছুক্ষণ পর বাসব চায়ের খোঁজে যখন রান্নাঘরে ঢুকেছিল তখন বৌটি বলেছিল, ওগো আমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাবে।

কলকাতায় কেন? বাসব ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

একবার ডাক্তার দেখাব।

ডাক্তার? বুঝেও না বোঝার ভাণ করল বাসব।

হ্যাঁ, কেন আমার এমন অবস্থা তাই দেখাব। আমার স্বাস্থ্য তো এমনিতে খারাপ নয়। কোন শক্ত অসুখ-বিসুখও নেই। তবে?

বাসব হেসেছিল, ভগবানের সঙ্গে লড়াইয়ে ডাক্তারকে হারাতেই হবে।

তার মানে?

মানেটা আর বাসব খুলে বলেনি। আস্তে আস্তে সরে গিয়েছিল সেখান থেকে। বৌটি অনেকক্ষণ আর মুখ তুলতে পারেনি। লজ্জা নয়, সঙ্কোচ নয়, একটা দারুণ দাহে অস্থি পুড়ে যেন ছাই হয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ ছিল। বৌটি যাও বা দু একবার কথা বলতে চেষ্টা করেছিল, দারুণ ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়ে বাসব তাকে এড়িয়ে গেছে। সারাটা দুপুর তক্তপোশে উপুড় হয়ে বৌটি কেঁদেছে। নামজানা সমস্ত দেবতাকে স্মরণ করেছে মনে মনে। একটি পৃথক সত্ত্বা, দুজনের মিলিত স্পর্শে আর একটি প্রাণের দীপ্তি প্রার্থনা করেছে আকুলভাবে।

কিন্তু আকুল আবেদনের সাড়া মেলেনি।

চুপি চুপি ঠাকুরঘরে গিয়ে মাথা খুঁড়েছে। পাষাণ বিগ্রহের ভাবান্তর ঘটেনি।

বুকের ব্যথা বুকে চেপে সংসার করেছে বৌটি। শাশুড়ীর সেবা, স্বামীর সোহাগ খেতে খেতে চমকে উঠেছে মাঝে মাঝে। অন্য কথা মনে এসেছে। ভেবেছে, যে লোকটি এত কাছে এসে একান্ত হয়ে ভালবাসার মিষ্টি কথা শোনাচ্ছে, সেই একদিন চোখের সামনে দিয়ে অন্য লোকের হয়ে যাবে। আর একজনকে সোহাগ করবে ঠিক এমনিভাবে। ভাবতে ভাবতে দু চোখ ভরে গেছে

জলে। আঁচল দিয়ে চোখ চেপে স্বামীর আলিঙ্গন থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করেছে।

শিবানী আরও একটু এগিয়ে এল। এখান থেকে সদর দরজাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করা। এছাড়া আরও একটি দরজা আছে পিছন দিকে। খিড়কী দরজা। সেটা খুললেই আর একটা পুকুর। চারধারে সুপুরী গাছের বাহার। সে পুকুর বাসবদের নয়, মজুমদারদের।

কাকচক্ষু জল। প্রত্যেক মাসে শ্যাওলা পরিষ্কার করা হয়। ঝাঁজি তোলা আর আগাছা ওপড়ানো।

সেই পুকুরেই বাসবরা স্নান করা কাপড় কাচা সব করত। খাবার জলও ভরত সেখান থেকে। সেই ঘাটের চাতালে বসে কতদিন বৌটি গভীর রাত পর্যন্ত কেঁদেছে। গুমরে গুমরে কান্না। সে কান্না শোনার জন্য কেউ জেগে থাকেনি। কারো ব্যগ্র হাত ছুটে আসেনি বৌটিকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করেছে। একবার নয়, বহুবার।

একি সত্যি, তার স্বামী আবার একজনকে অঙ্কশায়িনী করবে। মন্ত্র পড়ে, এতদিন একসঙ্গে বাস করে, আদর যত্ন কিংবা তার ভাল করে যাকে কাছে কাছে রেখেছিল, যে তার দ্বিতীয় সত্ত্বার মতন, তাকে এক মুহূর্তে সরিয়ে দেবে একপাশে। অবহেলার আবর্জনায়।

আর একজনকে বসাবে তার জায়গায় একই বাড়িতে দুজনে থাকবে। হয়তো পাশাপাশি। নতুন মিলনের খিলখিল হাসি কান পেতে শুনতে হবে। চুরি করে দেখবে দুজনের মদির কটাক্ষ বিনিময়। বৌটির প্রথম বিবাহিত জীবনের দৃশ্যগুলো আবার পুনরাভিনীত হবে, অবশ্য কেবল নূতন নায়িকা নিয়ে।

অথচ বৌটির কি দোষ? এতটা শাস্তি পাবার মতন কোন্ অপরাধ সে করেছে।

বাসব বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। নেহাৎ দায়সারা গোছের উত্তর। তাও দু একটা কথায়। মনে হল, বাসব কি একটা যেন ভাবছে। নতুনভাবে, নতুন মানুষ নিয়ে কেমন করে জীবন শুরু করবে, সেই কথাই কি।

একটা সবুজ ফড়িং অনেকক্ষণ ধরে কচুপাতার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কি ভেবে বসতে গিয়েও বসছিল না। এলোমেলো হাওয়ায় কচুপাতাগুলো দুলছে। সেইজন্যই বুঝি ফড়িংটা ভয় পাচ্ছে। সেদিনও বৌটি এমনই ভয় পেয়েছিল। সমস্ত সংসারটা যেন দুলছিল। মানুষগুলোও অস্থির চিত্ত। কারুর ওপর নির্ভর করা যায় না। অবলম্বন করা যায় না কাউকে। সবাই চাইছে, পুরোনো মানুষ সরে গিয়ে নতুন মুখ আসুক। এক অপূর্ব কলকাকলীতে ভরে উঠুক সংসার। ছোট দুটি মুঠির বাঁধনে গোটা সংসারটা বাঁধুক। একদিন বৌটি লুকিয়ে লুকিয়ে ভাজকে একটা চিঠি লিখেছিল। বাপের বাড়ির দিকে ফিরে চাইবার মতন তার কেউ ছিল না। বাপকে ভাল করে তার মনেই পড়ে না। অস্পষ্ট একটা ছবি দেখে আবছা একটা রূপ কল্পনা করে নেয়।

মাকে দেখেছে। জীর্ণ, রোগক্লিষ্ট চোহারা। দু পা চলতে গেলে হাঁপায়। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন খাওয়া দাওয়া বন্ধ। ঘরের কোণে ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে শুয়ে থাকত।

সংসার করার সাধ তার মিটে গিয়েছিল। সুস্থ থাকলে কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাত, মেয়েটিকে কোন রকমে পার করে দাও ঠাকুর। আর কিছু চাই না। বেশি কিছু চাইবার মতন

বরাতও করে আসেনি দু-বেলা দু মুঠো খেতে পায়। আর পরনের কাপড় জোটে তা হলেই হবে।

বৌটির মা বুঝি একটা কথা প্রার্থনায় জানাতে ভুলে গিয়েছিল। ভাত কাপড়ই শেষ কথা নয়, শান্তি, শান্তি যেন পায় মেয়েটা। একবেলা খাবার জুটুক ক্ষতি নেই, পরনের বসন শতচ্ছিন্ন হলেও ক্ষোভের কিছু নেই, কিন্তু যদি সুখ না থাকে মনে আনন্দ না থাকে, তাহলে জীবনের হাজার সম্পদ বরবাদ হয়ে যায়।

মা যেন বিয়েটা দেখার জন্যই বেঁচেছিল। বিয়ে হয়েছিল মাঘ মাসে, মা গেল বৈশাখে, শেষ সময়ে মেয়ে মাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পায়নি। ভাই বদলী হয়েছিল জামালপুরে। মা ছেলের কাছে দেহ রেখেছিল। এখন ভাই জামালপুরে নয়, পাটনায়। বৌটি সেখানেই চিঠি দিল।

চিঠিটা ভাজকে উদ্দেশ্য করেই লিখল, কিন্তু আসল লক্ষ্য দাদা। দাদা যেন পড়ে। এবং একটা বিহিত করে। নাহলে বৌটি বা যাবে কোথায়। কার দিকে চাইবে।

এদের, মানে এবাড়ির হালচাল যেন ভাল লাগছে না। কেমন একটা থমথমে ভাব। ভাল করে কেউ কথা বলে না। কেবল এধারে ওধারে ফিসফিস পরামর্শ। বৌটি গেলেই সব থেমে যায়। ওর কথা বলার ভাণ করে। আসল কথাটার আভাসও তার মানে?

মানে, তুমি যদি প্রশ্ন করো, আজ রাতে আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যা কত। বলতে পারব না কারণ সংখ্যাটা আমারই জানা নেই।

চালাকি রাখ। দেবে তো উত্তর?

প্রশ্নটা করেই দেখো না।

বৌটি বাসবের গা ঘেঁষে শুতে শুতে বলেছিল তুমি নাকি আবার বিয়ে করবে? পাত্রীও নাকি ঠিক হয়ে আছে?

কয়েক মিনিটের নিস্তব্ধতা। বাসব চুপচাপ রইল, তারপর পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, মাঝে মাঝে তোমার মাথায় বুঝি ভূত চাপে?

আজই শুনে এলাম।

কার কাছে?

চাটুজ্জেদের ন'বৌ এসেছিল আমার কাছে। একটুও না থেমে বৌটি বলেছিল।

তোমার চাটুজ্জেদের ন'বৌ ঘটকগিরি করছে বুঝি?

না, তবে যিনি করেছেন, তাঁর কাছ থেকেই শুনেছে।

বাসব এবার উঠে বসল। অন্ধকারে বৌটির মুখ ঠিক দেখা গেল না, কাজেই সে মুখের লিপি পড়া সম্ভব হল না। আস্তে আস্তে বলল, ঘটক চূড়ামণিটি কে?

পূর্বপাড়ার দামোদর চক্রবর্তী। সঙ্গে সঙ্গে বৌটিও উঠে বসেছিল। উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর কাঁপছে। বাসবের মনে হল, ইতিমধ্যে দু-এক ফোঁটা জলও বোধ হয় পড়েছে চোখ থেকে।

বাসব নিজেকে সামলে নিয়েছিল। খুবগম্ভীর গলায় বলেছিল মাঝরাত্রিতে রসিকতা শোনার মতন সময় আমার নেই। ভোরে অফিস আছে। আমায় ঘুমুতে হবে। বাসব পাশ ফিরে শুয়ে

ঘুমোবার ভাণ করেছিল। বৌটি আর কথা বাড়ায়নি। এটুকু বুঝতে পেরেছিল, একটা কথা বললেই বিরক্ত হবার ছুতো করে বাসব হয় মেঝের ওপর কিংবা বারান্দায় গিয়ে শোবে।

কিছুক্ষণ পরে বাসব সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু বৌটি ঘুমোয়নি। চুপচাপ শুয়ে শুয়ে বাইরের তারাভরা আকাশের দিকে চেয়েছিল।

এরা কেউ কিছু বলেনি, কেউ কিছু বলবেও না, কিন্তু বৌটি ঠিক বুঝতে পেরেছে। বিরাট একটা বাদুড় কালো ডানা প্রসারিত করে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারকে আরো সুচিভেদ্য করে। তমিস্যার গাঢ় স্রোতে বৌটি নিঃশেষে মুছে যাবে সে সম্ভাবনা দূরে নয়।

শাশুড়ীকেও কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিল দুপুরবেলা। শাশুড়ীর পা দুটো কোলে নিয়ে বৌটি বসেছিল। বাঁজা মেয়েকে নিয়ে ঘর করতে স্বামী রাজী নয়? সম্ভবত আর একবার বিয়ে করার চেষ্টা করছে। তাই যদি হয়, স্বামীপ্রেমের শরিক যদি আসে, তা'হলে বৌটি কি করে বাঁচবে। সবচেয়ে কাছের লোকটা যদি সবচেয়ে দূরে সরে যায় তা'হলে সংসারের আকর্ষণটুকুই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

উত্তর এসেছিল। এমন সময়ে এসেছিল, যখন বৌটি উত্তরের আর আশা ছেড়ে দিয়েছিল।

এর মধ্যে এ সংসারে আরো ঢেউ উঠেছে। সে ঢেউ বৌটিকে অতলে তলিয়ে নিয়ে যাবার রুদ্ধ আক্রোশে আছড়ে পড়েছে তার চারিদিকে।

দামোদর চক্রবর্তী, এ গাঁয়ের পূর্বপাড়ার বাসিন্দা। মাতব্বর লোক। যাগে যজ্ঞে, শোকে তাপে, আনন্দে প্রমোদে গাঁয়ের লোকদের পক্ষে অপরিহার্য। আড়ালে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, কিন্তু ওই আড়ালেই। সামনে বলার সাহস কারো নেই। কোনো এক বিধবা বৌদির সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিজে গুছিয়ে নিয়েছেন এমন একটা প্রতিশ্রুতি গাঁয়ে প্রচলিত আছে, কিন্তু তা নিয়ে আজ আর কেউ মাথা ঘামায় না। দামোদর চক্রবর্তীর প্রখর ব্যক্তিত্বের দাপে ছোট খাটো ত্রুটি বিচ্যুতি মুছে গিয়েছে।

সেই দামোদর চক্রবর্তী একদিন সদরে এসে বসলেন।

ছুটির দিন। অফিস যাবার তাড়া নেই। সারা দিনটাই ঢিমে ছন্দে বাঁধা রান্না করার ফাঁকে ফাঁকে বৌটি দরজার কপাটের ফাঁকে চোখ রেখেছিল। সব কথা কানে আসেনি, যা দু-একটি এসেছিল তাতেই তার মুখের সবটুকু রক্ত নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবাজী, এর জন্য আর চিন্তার কি আছে। শাস্ত্রে তো বিধানই রয়েছে। একেবারে অফিসের পীতাম্বর মুখুটির প্রতিধ্বনি।

দামোদর চক্রবর্তী আরো এক ধাপ এগিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোটা পাঁচেক পাত্রীর ফিরিস্তিও দিয়েছিলেন। ভেজানো কপাটের ফাঁক দিয়ে বৌটি স্বামীর মুখটা দেখবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি, দেখতে চেয়েছিল সে মুখে কিসের চিহ্ন। বেদনার না প্রচ্ছন্ন উল্লাসের।

দু হাতে নিজের বুক চেপে বৌটি সরে গিয়েছিল।

ভাজ লিখেছিল, ও সব বাজে কথা। ঠাকুরজামাই ঠাট্টা করেছেন তোমার সঙ্গে। আজকাল

আবার এই কারণে দ্বিতীয়বার কেউ বিয়ে করে? তাছাড়া এমন কিছু বয়স হয়নি তোমার। এর মধ্যে হতাশ হবার মতন কি হয়েছে?

ভাই কিন্তু অন্য কথা লিখেছিল। যদি বাসব অন্য পত্নীই গ্রহণ করে, সংসারের প্রয়োজনে, বংশরক্ষার প্রয়োজনে হয় তো তার একাজ করা ছাড়া পথ নেই, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা বৌটির সহজভাবে গ্রহণ করা উচিত। নিজের ব্যক্তিগত সুখ, স্বাচ্ছন্দ আনন্দ পুলক সবকিছু সংসারের প্রয়োজনে বলি দেওয়া কর্তব্য। সাধ্বী স্ত্রীলোকদের এই রীতি।

আরো দু পাতা ছিল সাধ্বীদের অন্যান্য কর্তব্য সম্বন্ধে। সবটা পড়ার ধৈর্য বৌটির ছিল না।

চিঠিটা টুকরো টুকরো করে পিছনের আগাছার জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। মনকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছিল অমোঘকে বরণ করে নেবার জন্য, কিন্তু পারেনি, সব কিছুর অন্তরালে গোপন কাঁটা বুকের মাঝখানে গিয়ে বিঁধেছিল। নড়তে চড়তে গেলেই অব্যক্ত একটা বেদনা, নীরবে রক্তক্ষরণ।

মাঝে মাঝে সোজাসুজি বাসবকে প্রশ্নও করেছিল।

শুতে যাবার আগে মশারী ফেলতে ফেলতে বৌটি বলেছিল, কিগো ঘুমুলে নাকি? বাসব ঘুমোয়নি। চিৎ হয়ে শুয়ে পান চিবোচ্ছিল। বৌটির কথায় উত্তর দিয়েছিল, উঁহু।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

করো।

সত্যি উত্তর দেবে তো?

উত্তর যদি জানা থাকে তো, দেব।

পা টিপতে টিপতে বলেছিল,একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মা?

শাশুড়ী বিরক্ত হয়েছিলেন, বল বাছা কি বলবে। একটু ঘুম এলেই তোমার যত কথা।

বৌটি ভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করেছিল।

একটু পরে শাশুড়ীই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, কই কি বলবে বাছা, বল?

মাথা নীচু করে খুব মৃদু গলায় বৌটি জিজ্ঞাসা করেছিল আপনার ছেলের নাকি আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন।

শাশুড়ী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, তা আর কি করব বাছা। তুমি তো পারলে না সংসারে শান্তি আনতে। এত বছর বিয়ে হল, কোলে একটা কিছু এল না। আর যে আনবে এমন সম্ভাবনাও কম। কাজেই, বংশরক্ষার কথা তো ভাবতেই হবে।

বহু কষ্টে চোখের জল ঠেলে বৌটি উঠে পড়েছিল। শোবার ঘরে ঢুকে আর পারেনি নিজেকে সংযত করতে। কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। চোখের জল মোছেনি। শাশুড়ী কান্নার শব্দে ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়াতে পারেন, সে কথা একবারও ভাবেনি। এত সব ভাববার অবকাশ তার ছিল না। পায়ের তলা থেকে আচমকা মাটি সরে গেল যেমন নিরালম্ব অবস্থা হয়, বৌটির অবস্থা ঠিক তেমনিই হয়েছিল।

এতদিন যে কথাটি বৌটির আড়ালে ফল্গুস্রোতের রূপ নিয়েছিল, আন্দাজে শুধু স্বরূপ বুঝতে হয়েছিল বৌটিকে, সেই কথাটা গোপনতার বোরখা খুলে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল।

তার মানে এ সংসারে আর বৌটিকে চায় না। সংসার ভালবাসে, ছায়া দেয়, পরিবর্তে প্রতিদান চায়। পুরুষ অর্থ দিয়ে তাকে পরিপূর্ণ করবে। নারী দেবে নিজের হৃদয়ের অংশ। নিজের মমতা আর পুরুষের পৌরুষ মিশিয়ে নতুন যে সত্তার আর্বিভাব হবে তাকে পৃথিবীতে আনার দায়িত্ব নারীর।

এ প্রতিদান বৌটি দিতে পারেনি, তাই সংসারের বিরাট চাকার তলায় তার পিষ্ট হওয়া ছাড়া, অন্য গতি নেই।

শিবানী এবারে হন হন করে বেশ কিছুটা এগিয়ে এল। পায়ে চলা পথটার কাছাকাছি।

ঠিক দরজার ওপারে তুলসী মঞ্চ। রোজ সন্ধ্যায় তার তলায় প্রদীপ রেখে গলায় আঁচল জড়িয়ে বৌটি প্রণাম করত। বিয়ের পর স্বামীর মঙ্গল কামনা করত। সংসারের উন্নতি, তারপর রোজ সন্ধ্যায় শুধু এক প্রার্থনা।

সে সন্তানবতী হতে চাইত, তার সামর্থ স্বল্প, বিত্ত প্রায় শূন্য, তবু তার যা আছে, যতটুকু আছে, দেবতাকে অর্পণ করবে, শুধু পরিবর্তে একটি প্রার্থনা। তরু ফলবতী হোক।

বৌটি বুক চিরে রক্ত দেবে, হাতের ক্ষয়ে যাওয়া চুড়ি দুটো বাঁধা দিয়ে, বেচে ঠাকুরের পুজো দেবে। নতুন অতিথির কলঝঙ্কারে শুধু এ সংসার মুখরিত হ'ক।

বন্ধ্যা নারীর প্রার্থনাও বন্ধ্যা হল।

আরো কঠোর হ'ল সংসার। সংসারের লোকগুলো মুখের ওপর নিস্পৃহতার মুখোশ টেনে দিল।

প্রত্যেক শনিবারেই বাসবের অফিস থেকে ফিরতে দেরী হ'ত। কোন একদিন রবিবার বিকালেও বেরিয়ে যেত। ফিরে এসে ঘরে দরজা বন্ধ করে মা বেটায় চাপা গলায় ফিসফিস কথাবার্তা।

বন্ধ দরজায় কান পেতে বৌটি শোনবার চেষ্টা করত। কিছু শুনতে পেত, বেশিরভাগই পেত না। যেটুকু কল্পনার রূপ মিশিয়ে উজ্জ্বল করে তোলার চেষ্টা করত।

ভাবী সংসারের ছবি যত উজ্জ্বল হয়ে উঠত, বৌটির মনের ছবি সেই পরিমাণে বিবর্ণ।

অবশেষে কাল রাত্রি এল।

খাওয়া দাওয়ার পর বৌটি ঘরে ঢুকেই দেখেছিল বাসব জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

বৌটি ঘরে ঢুকতেই বাসব ঘুরে দাঁড়াল।

বস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

আমার সঙ্গে? ভয়ার্ত, ক্ষীণ কণ্ঠে বৌটি অন্ধকার বিছানার এক কোণে বসেছিল। পা দুটি ঝুলিয়ে।

একটা মাত্র চেয়ার, যে চেয়ারটাকে টেনে তক্তপোষের কাছাকাছি বাসব নিয়ে গিয়েছিল, হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিতে দিতে বলেছিল, লুকোচুরি করে আর লাভ কি। কথাটা

তোমার জানাই দরকার।

বৌটির মনে হয়েছিল, আস্তে আস্তে সব দুলছে। তক্তপোষ, ঝোলানো বাতি, চেয়ার, চেয়ারে বসা মানুষটা পর্যন্ত। ক্লান্ত দুটি দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। না, বাসবের দিকে নয়। জানলার বাইরে জমে থাকা গাঢ় তমিস্রার দিকে। যে তমিস্রা ওর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতীক।

অনেক ভেবে দেখলাম, এছাড়া আমার আর পথ নেই। গোটা সংসারটা তো আর নষ্ট করা যায় না এইভাবে। মারও খুব ইচ্ছা নাতির মুখ দেখেন, আর আমিও—

তুমি, তুমি কি ভাবো? একটা নিরপরাধ দুঃখিনী মেয়ের জীবনে এইভাবে অশান্তির দাবানল জ্বালাবে।

এত কথা শুধু, বৌটির মনেই এসেছিল, ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। একটা কথাও সে বলতে পারেনি।

বাসবই বলেছিল, তোমার আর কি অসুবিধা। দুজনে থাকবে দুই বোনের মত। আগেকার দিনে তো এমন হ'ত। তোমাকে তো আর কেউ অযত্ন অবেহেলা করছে না।

না, তা কেউ করবে না। কেবল রাত হলেই শাশুড়ীর সঙ্গে শুতে হবে এক বিছানায়। সারাটা রাত নিদ্রাহীন শরশয্যায় বিছানা করতে হবে। নতুন বৌটিকে স্বামীর কাছে এগিয়ে দিয়ে, নিজেকে সরে দাঁড়াতে হবে।

তারপর, তারপর ক্ষণেকের জন্য বৌটির দুটি চোখ বুঝি জ্বলে উঠেছিল, যদি কোলে সন্তান আসে নতুন বৌটির, তাহলে এ সংসারের জীর্ণ আবর্জনার সমগোত্র হয়ে বৌটি সারাজীবন এক পাশে পড়ে থাকবে।

কোন অসুবিধা নেই। দু বেলা দু মুঠো অন্ন, আর পরনের বাস, এটুকু দিতে এ সংসার কখনও হয়তো কার্পণ্য করবে না। তা হ'লে আর কিসের দুঃখ বৌটির।

সে রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাসব অনেক কিছু বৌটিকে বুঝিয়েছিল, কথাবার্তার ফাঁকে একবার তার গায়েও হাত রেখেছিল, কিন্তু শীতল স্পন্দনহীন একটা দেহের ওপর বেশিক্ষণ হাতটা রাখতে পারেনি।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বৌটি সারাক্ষণ শুধু ভেবেছে, এ সংসারে তার ভূমিকা শেষ, এবার সে কোথায় যাবে? এ কালামুখ লুকাবে কোন অন্ধকারে।

শিবানী দরজা পার হয়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। অনেকদিন পর সে এ বাড়িতে ঢুকেছে। কিন্তু কিছুই নতুন বলে মনে হচ্ছে না। পাঁচিলের গায়ে ঘুঁটের সার। উঠানের কোণ ঘেঁষে আগাছার ঝোপ। সিঁড়ির তলায় কাঠকুটোর স্তূপ। ভাঙা চেয়ার থেকে শুরু করে টেবিলের পায়া ঝুড়ি চুবড়ি, চেরাকাঠের জঞ্জাল।

আর একবার ওপরের দিকে শিবানী চেয়ে দেখল। আলো জ্বলছে। মিটমিটে আলো, তারই ম্লান ছায়া জামরুল গাছের পাতাগুলোর ওপর পড়েছে।

সেদিন এই উঠানটাই সাজানো হয়েছিল, পাড়ার পুরুষেরা এসে জড় হয়েছিল। মেয়ের দল

এসেছিল শাঁখ ঘণ্টা হাতে। বাসবের অন্তরঙ্গ যারা, তারা এগিয়ে গিয়েছিল স্টেশন পর্যন্ত। বরবধূকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

সে রাতে বৌটির বিশেষ খোঁজ পড়েনি। সে যে আনন্দ মুখর এই জনতার মধ্যে থাকবেই না, এটুকু সকলের জানা ছিল। বেচারী হয়তো অন্ধকারের মধ্যে কোথাও চুপচাপ বসে আছে, কিংবা মুখ ঢাকা দিয়ে বিছানায় পড়ে আছে।

মোট কথা, বৌটি কোথায় সে দিকে কারোর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। সবাই উঁকি দিচ্ছিল স্টেশনের রাস্তার দিকে। কখন আমবাগানের ফাঁকে অনেকগুলো আলো দেখা যাবে। অনেকগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত কলরব।

বৌটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল অনেক পরে।

এঁটো বাসনের স্তূপ নিয়ে কামিনী ডোবার কাছ বরাবর গিয়েই চীৎকার করে উঠেছিল, পথের ওপর বাঁশে একটা হ্যারিকেন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। আলো হয়ত খুব জোর নয়, কিন্তু সেই আলোতেই বেশ দেখা গেল।

ওগো মাগো। কামিনীর চীৎকার, সঙ্গে সঙ্গে বাসনের ঝনাৎকার।

খুব ঘটার বিয়ে না হ'লেও, বাড়িতে বাড়তি লোক কিছু ছিলই। তারা ছুটে এসে দাঁড়াল। একবার উঁকি দিয়ে পুরুষরা সরে গেল। মেয়েরা পাল্টা চেঁচামেচি শুরু করল।

লোকের পিছনে বাসবও এসে দাঁড়িয়েছিল, দুটো চোখ বিস্ফারিত করে সেও দৃশ্যটা দেখেছিল।

এতটা কিন্তু কেউ আশা করেনি। ছেলেও নয়, ছেলের মাও না।

বৌটি অসুখী, এমন একটা ব্যাপারে সেটাই স্বাভাবিক। স্ত্রীলোক সব দিতে পারে, সব কিছুর ভাগ, কেবল স্বামীর ভাগ ছাড়া। কিন্তু তা বলে মাদার গাছের নীচু ডালে পরনের শাড়ি বেঁধে এবাবে নিজেকে শেষ করবে এ কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি।

এমন নির্লজ্জ কি করে হতে পারল বৌটি। সেকি, নিজের যৌবনপুষ্পিত দেহ সকলের সামনে উন্মোচিত করে প্রমাণ করতে চেয়েছিল, এ বন্ধ্যাত্ব তার দোষ নয়। পীন পয়োধর, ক্ষীণ কটি, গুরু উরু, নারীর সমস্ত ঐশ্বর্যের সে অধিকারিণী। সংসার তাকে বঞ্চনা করেছে সংসারের মানুষ প্রতারিত করেছে তাকে। অকারণে তাকে সংসারচ্যুত করেছে বিনা দোষে।

সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিল নতুন বৌ সুরমা। উন্মুক্ত অবারিত নারীদেহের দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারেনি, কিন্তু যখন বৌটির দেহ নামিয়ে, পুলিসের ঝামেলা মিটিয়ে লালপাড় শাড়ি পরিয়ে, সীমান্তে সিঁদুর পায়ে আলতা দিয়ে বাঁশের শয্যায় শোয়ানো হয়েছিল, তখন সুরমা নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। অন্য সব স্ত্রীলোকের সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পায়ের ধুলো নিয়েছে। স্বীকার করেছে, আজকের উৎসব সুরমাকে কেন্দ্র করে হবার কথা, কিন্তু ওই নিষ্প্রাণ চন্দনচর্চিত বিয়ের সাজে সজ্জিতা মহিলাটি উৎসবের সবটুকু আনন্দ অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। আজ সে নিজেকে নিঃশেষ করেও বিজয়িনী।

তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে শিবানী ওপরে উঠে এল। কেউ কোথাও নেই। তাতে তার কোন

অসুবিধা নেই। সিঁড়ির প্রত্যেকটি ধাপ তার চেনা বাড়িঘরের প্রতিটি জানলা, দরজা।

তারস্বরে শিশুটি চেঁচিয়ে চলেছে। ধারে কাছে কেউ নেই। শাশুড়ী ভিনগাঁয়ে বোনের বাড়ি আজ সকালে গেছেন গরুর গাড়ি করে। ইদানীং ছানি কাটিয়ে অনেকটা সমর্থ হয়েছেন। এদিক ওদিক যাওয়া আসা করেন।

বাসব এখনও ফেরেনি। আজকাল তার ফিরতে বেশ রাত হয়, এটা শিবানী লক্ষ্য করেছে। অফিসের পরেও একটা টিউশানি করে। শুধু মাইনের হাওয়ায় সংসার তরণী অচল। পালে বাড়তি হাওয়ার জন্য বাড়তি রোজগারের প্রয়োজন। ছোট্ট একটা বাড়তি প্রাণী হ'লে হবে কি। তার ঝঞ্ঝাট অনেক। সুরমার বুকে দুধ নেই কাজেই নানা ধরনের ফুডের প্রয়োজন। প্রসবের পর থেকেই আনুষঙ্গিক নানা ব্যাধিতে শরীর দুর্বল। দেহে রক্ত নেই, কালি পড়েছে দু চোখের কোণে। একটু চললেই বুক চেপে হাঁপাতে থাকে। একটা বৌ গেছে দুর্বার স্বাস্থ্য নিয়ে, আধিব্যাধির বালাই তার ছিল না। কিন্তু এ বৌয়ের দাম অনেক বেশি। এর কল্যাণে বংশরক্ষা হয়েছে। সোনার চাঁদ এসেছে। এ বৌয়ের প্রাণের মূল্য অনেক। তাই ডাক্তার আসছে, কবিরাজ আসছে। অফিস ফেরত বাসব দু' হাতে রোজ ওষুধের পোঁটলা বয়ে আনছে।

ওপরে উঠে শিবানী চৌকাঠের কাছে দাঁড়াল। ঘরের এক কোণে ছেলেটা শুয়ে চেঁচাচ্ছে। নক্সাকাটা কাঁথা, লাল রংয়ের দুটো বালিশ। চুলগুলো ঝুঁটি করে বাঁধা লাল ফিতে দিয়ে। কপালের এককোণে কাজলের ফোঁটা। এর অর্থ শিবানীর অজানা নয়। কুনজর যেন না পড়ে, খারাপ বাতাস না লাগে। কোন অমঙ্গল না হয় শিশুর।

সুরমা নেই। সুরমা কোথায় গেছে। শিবনী জানে। পিছনের পুকুরে গা ধুতে গেছে। যাবার সময় ছেলেটাকে হয়তো ঘুম পাড়িয়েই গিয়েছিল। হঠাৎ জেগে উঠেছে। ধারে কাছে কাউকে না পেয়ে চীৎকার শুরু করেছে।

এ কান্না সুরমার কানে যাবার কথা নয়। বাড়ির দরজা জানলা সব বন্ধ। বৃষ্টির জন্য সুরমা সম্ভবত বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু শিবানীর কানে ঠিক গেছে। দেড় বছর ধরে এমনই এক সুযোগের প্রতীক্ষায় সে ছিল। ধারে কাছে কেউ থাকবে না। অসহায় শিশু শুধু থাকবে অরক্ষিত অবস্থায়। ছোট্ট একটা মাংসপিণ্ড। ক্রন্দন সম্বল, নিস্তেজ, কিন্তু তবু শক্তি কম নয়। একটা নারীর জীবনের গতি ঘুরিয়ে দিল। একজনের অস্তাচলের রং নিয়ে আর একজনের উদয়াচল রাঙাল।

এ শত্রুকে পরমায়ু ভিক্ষা শিবানী দেবে না।

আস্তে আস্তে এগিয়ে শিবানী একেবারে শিশুর গায়ের কাছে দাঁড়াল। একটা পা তুলল। শিশুর ক্রন্দন এখনই থেমে যাবে। এই মুহূর্তে একেবারে চিরদিনের মতন।

পা দিয়ে শিশুর গলাটা চাপতে গিয়েই শিবানী থেমে গেল। চোখে পড়ল দেয়ালের ফটোটার ওপর।

শিবানীর ফটো। সীমান্তে সিঁদুর, সিঁদুর পায়ের কাছে। ফটোতে টাটকা ফুলের মালা। বোধ হয়

বিকালেই দেওয়া হয়েছে। শিবানী চমকে উঠল।

তারই ফটোর সামনে সুরমা এবারে শিশুটিকে শুইয়ে রেখেছে? শিবানী ভেবেছিল এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মুছে গেছে। ঐ বাড়ির বাসিন্দাদের মনে তার স্মৃতির ছায়া মাত্রও নেই। পরাজিত, নিষ্পাপ সত্বাকে কেউ মনে রাখে না।

কিন্তু সুরমা আজও তাকে স্মরণ করে। কে জানে বাসবও কোনদিন এ ছবির সামনে এসে দাঁড়ায় কিনা।

নতুন জীবন উপভোগ করতে করতে পুরনো কোন কথা, কোন চিন্তা সামান্য ঢেউ তোলে কিনা মনের সায়রে।

সবচেয়ে বড় কথা, যে স্বাদ সংসারে থাকতে শিবানী পায়নি, তার ক্ষোভ, তার তৃষ্ণা মেটাবার জন্যই বুঝি রক্ত মাংসের এই ঢেলাটাকে দুজনে মিলে তার প্রতিকৃতির সামনে রেখে দিয়েছে। তার ভালবাসা, তার ঘৃণাকে রক্ষা করবে এই সম্ভাবনায়।

শিবানী পা তুলে নিল। দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠানে এসে দাঁড়াল।

আশ্চর্য, পরিপূর্ণ এই সংসার থেকে চলে যেতে শিবানীর মন যেন উঠছে না, কিন্তু, তবু যেতে হবে।

অনেকদূরে। এই শিশুর অসহায় কান্না যেখানে পৌঁছাবে না। তৃপ্তির সমুদ্রে প্রতিহিংসার নীল ফসফরাস আর তাকে কোনদিন চঞ্চল করবে না।

শিবানী সদর দরজা পার হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রূপে সে কুরূপা

পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যাঁদের বয়স পঞ্চাশের কাছে, তাঁদের ঘটনাটা নিশ্চয় মনে আছে। একটি কুমারী মেয়ে নিজের শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল।

এ ধরনের ঘটনা কলকাতা শহরে তখন প্রথম। নানা জনে নানা কথা বলেছিল। কেউ বলেছিল, হতাশ প্রেমের ব্যাপার, কেউ বলেছিল, বাপ পণের টাকা যোগাতে অক্ষম তাই নিজেকে নিঃশেষ করে মেয়েটি বাপকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। আবার দু একজন রসিক লোক মেয়েটি গর্ভিণী, পেটের লজ্জা লুকোতে এমন কাজ করেছে, এও বলেছে।

আসল ব্যাপারটা আমার জানা।

মেয়েটির নাম বেলা। ছাপোষা বাপের তৃতীয় সন্তান। ভদ্রলোকের চারটি মেয়ে। বহু কষ্টে ধার ধোর করে প্রথম দুটিকে পার করে ছিলেন, কিন্তু তিন নম্বরে এসে মোক্ষম ঠেকে গেছেন, কারণ মেয়েটি কালো। সাধারণত এদেশে কালো মেয়েকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে চালাবার একটা রেওয়াজ আছে, কিন্তু এ মেয়ে সত্যি সত্যিই কালো। তবে কালো হলেও, অপূর্ব লাবণ্যময়ী, মুখশ্রী তুলনাহীন।

আমি বেলার প্রতিবেশী। সে আমাকে কাকা বলেই ডাকে। পথে ঘাটে দেখা হলে বেলার বাবা আমার দুটো হাত জাপটে ধরে অনুরোধ করেন, বেলার জন্য যেন একটি পাত্রের সন্ধান করি। আমি অবশ্য তাঁকে নিরাশ করি না।

হঠাৎ এক সুযোগ জুটে গেল। অরবিন্দ আমার বন্ধুর ভাই। তার সেজদা আমাদের কলেজের সতীর্থ। শুনলাম অরবিন্দর বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে। যোগাযোগ করলাম। অরবিন্দর রং কালো। কাজেই ভাবলাম, কালো মেয়েতে হয়তো তার আপত্তি হবে না। ছেলেটি মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী। মাইনে ছাড়াও বাড়তি রোজগার আছে।

অরবিন্দর সঙ্গে একটি বন্ধু এল। আর আমি তো বরের ঘরের পিসি আর কনের ঘরের মাসি হিসাবে সঙ্গে রইলামই। লক্ষ্য করলাম, বেলা এসে সামনে বসার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দর মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

তারপর অরবিন্দ স্পষ্ট বলেই ফেলল, বেলার বাপের দিকে মুখ ফিরিয়ে "আমি ভেবেছিলাম আপনার মেয়ের রং সামান্য ময়লা। কিন্তু এ যে দেখছি একেবারে বার্ণিশ করা। আমাকে মাপ করবেন।"

মেয়ের বাপকে অনেক অপমানই সহ্য করতে হয়, তাই বেলার বাপ এসব গায়ে মাখলেন না। বললেন, "আপনারা সবাই যদি এ কথা বলবেন, তাহলে এদেশের কালো মেয়েরা যাবে কোথায়? যাঁদের রং একটু কালো। তারা কালো মেয়ে নেবেন না, যাঁরা ফর্সা, তাঁদের ওই এক কথা। তাহলে কি কালো মেয়েদের হাত-পা বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব?"

অরবিন্দ কোন উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল তারপর সামনে রাখা খাবারের থালা স্পর্শ না করে বন্ধুকে নিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

বেলা সেই যে এসে মাথা হেঁট করে বসেছিল, তার দিকে যখন চোখ ফেরালাম, দেখলাম মাথাটা প্রায় মেঝের সঙ্গে ঠেকে যাচ্ছে। সমস্ত শরীর রুদ্ধ আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। বলবার কিছু ছিল না। কিছুক্ষণ বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে এলাম। ঘুম ভাঙল মাঝরাতে। নারী কণ্ঠের আর্ত চীৎকারে। বাঁচাও, বাঁচাও, জ্বলে মলুম। উঃ, বড় কষ্ট, বড় কষ্ট!...

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। নিশীথে শব্দ ঠিক কোনদিক থেকে আসছে বোঝা মুস্কিল। কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম, আওয়াজটা বেলাদের বাড়ি থেকেই আসছে। ছুটে চলে এলাম। তখন কিছু করবার ছিল না। রান্নাঘরে শিকল তুলে দিয়ে বেলা নিজের শরীরে বোতল বোতল কেরোসিন ঢেলে দিয়ে দেশলাই জ্বেলেছে।

দরজা ভেঙে যখন রান্নাঘরে ঢোকা হল, তখন বেলার কালো রং আর নেই। পুড়ে সর্বাঙ্গ লাল হয়ে গেছে। বেলার মা আর বাবা আছড়ে পড়লেন মেয়ের দেহের কাছে।

বাপ চেঁচিয়ে উঠলেন, এবার মাকে সাজিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা কর। আর কেউ কালো বলবে না। কুরূপা সেই অভিমানে মা আমার চলে গেল।

যেমন হয়, এই নিয়ে পাড়ায় বেশ কিছুদিন জটলা চলল। নানারকম মন্তব্য।

খবরের কাগজে ফলাও করে লিখল পণপ্রথার বিষময় ফল সম্বন্ধে আধ পাতা জুড়ে সম্পাদকীয়। তারপর একসময়ে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মাস ছয়েকের মধ্যে অরবিন্দ বিয়ে করল। নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, কিন্তু যেতে মন সরেনি। কেবল, বেলার মুখটা মনে পড়ছিল। বেলার বাপ এখানকার

বাসা উঠিয়ে চলে গেলেন। কোথায় খবর রাখি না।

বিয়েতে যাইনি, কিন্তু অরবিন্দর বউ দেখা অদৃষ্টে ছিল।

একদিন একটা কাজে ব্যাণ্ডেল যাব বলে হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ একেবারে সামনে অরবিন্দ। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, "আরে অজয়দা, আপনি?"

বললাম, "একটা কাজে ব্যাণ্ডেল যাব।"

"ব্যাণ্ডেল? আবার বিয়ের সম্বন্ধ নাকি!"

কথাটার মধ্যে ব্যঙ্গের হুল ছিল তাই উত্তর দিলাম না। বললাম, "তুমি কোথায়?"

—"আমি দিন পনেরো ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক পুরী চলেছি। আপনি তো আমার বিয়েতে রাগ করে গেলেনই না।"

"রাগ করে? রাগ করে কেন?"

—"তা ছাড়া আর কি। আপনার পাড়ার মেয়ে বিয়ে করিনি বলে। আপনি তো জয়াকে দেখেননি। দাঁড়ান আলাপ করিয়ে দিই।"

অরবিন্দ চলে গেল। লক্ষ্য করলাম, টিকেট ঘরের সামনে একটি তরুণী। তার পায়ের কাছে বিছানা, সুটকেশ, ছোটখাট মোট-ঘাট। অরবিন্দ তার কাছে গিয়ে থামল, আমাকে দেখিয়ে কি বলল তারপর একটা কুলিকে মালপত্র দেখতে বলে দুজনে এগিয়ে এল। একেবারে কাছে আসতে অরবিন্দ বলল, "জয়া, ইনি অজয়দা, সেজদার বন্ধু।"

জয়া হেঁট হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

ভাল করে দেখলাম। গৌরাঙ্গী, তবে নাক মুখ মোটেই ভাল নয়। মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের। পুরু ঠোঁট, দুটি চোখও খুব আয়ত নয়, গাল বেশ ফোলা ফোলা। গড়ন স্থূলতার দিকে। স্বভাবতই বেলার কথা মনে পড়ে গেল। তার রং কালো ছিল, কিন্তু মুখ চোখ অনেক সুন্দর।

অরবিন্দ আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, "জয়ার বাপের বড় বাজারে লোহার কারবার। বেশ মালদার লোক। দুই মাত্র মেয়ে। এটি বড়।"

বুঝলাম অরবিন্দ রূপ নয়, রূপোই খুঁজেছে। আমার ট্রেন এসে গিয়েছিল, তাই বললাম, "চলি অরবিন্দ। পরে দেখা হবে। বৌমাকে নিয়ে একদিন যেও আমাদের বাড়ি।

জয়া এবার দুহাত তুলে নমস্কার করল। তারপর আমরা ভিড়ে হারিয়ে গেলাম।

দিন তিনেক পর। কি এক ছুটির দিন। বারান্দায় বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা খবর ঃ

"পুরী প্যাসেঞ্জারে রহস্যজনক মৃত্যু!"

মাঝরাতে প্রথম শ্রেণীর কামরায় একটি যাত্রীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, এই কামরায় নব বিবাহিত দম্পতি ভ্রমণ করিতেছিল। স্ত্রী চেন টানিলে মধ্যপথে ট্রেন থামিয়া যায়।

গার্ড দেখিতে পায়, কামরায় মেঝের উপর ভদ্রলোক অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহার দুটি চোখ বিস্ফারিত। কণ্ঠনালিতে দশ আঙুলের ছাপ। মনে হয় তাঁহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা

করা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, ভদ্রলোকের ঘড়ি, আংটি, মানি ব্যাগ কিছুই অপহৃত হয় নাই। স্ত্রীর দেহে অনেক টাকা মূল্যের অলঙ্কারেও কেহ স্পর্শ করে নাই।

নিহত ভদ্রলোকের নাম, অরবিন্দ চৌধুরী, খবরের কাগজটা সামনে রেখে চুপচাপ বসে রইলাম। জয়ার মুখটা স্মৃতিপটে ভেসে এল। একটু পরেই গৃহিণী বাজার যাবার তাগাদা দিতে এসে থেমে গেল, কি হল? ওভাবে বসে আছ? শরীর খারাপ নাকি?

কোন উত্তর না দিয়ে কাগজটা তার দিকে ঠেলে দিলাম। বললাম, "এই জায়গাটা পড়।"

গৃহিণী পড়ে বলল, "একি তোমাদের অরবিন্দ নাকি?"

—"তাই তো মনে হচ্ছে। সব মিলে যাচ্ছে। বললাম না, অরবিন্দ বৌ নিয়ে পুরী গেল।"

—"বাবা, দেশে কি অরাজকতা হল। ট্রেনের কামরায় ডাকাতি।"

—"ডাকাতি আর কোথায়? কোন কিছু তো চুরি যায়নি।"

—"সে হয়তো সময় পায়নি। বৌটা চেঁচামেচি করে ওঠাতে নেমে গেছে। কিংবা এমনও হতে পারে, ট্রেন সম্ভবত স্টেশনের কাছে এসে পড়েছিল।"

সবই হয়তো সম্ভব। এতদূর থেকে কিছুই বলা যায় না।

আহা, বৌটার কথা ভাবছি। এই সেদিন বিয়ে হয়েছিল।

উঠে পড়লাম, আলনা থেকে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বললাম, "আজ চাকরকে বাজারে পাঠাও। আমি বেরোচ্ছি।"

—"কোথায় যাচ্ছ?"

—"একবার অরবিন্দর বাড়ি যাব। যাওয়া দরকার। খবরটা যখন জানতে পারলাম। সবাই নিশ্চয় শোকে মুষড়ে পড়েছে।"

আমি যে প্রান্তে থাকি, অরবিন্দর বাড়ি তার অপর প্রান্তে।

বাসে প্রায় ঘণ্টাখানেক। বাসে যেতে যেতে জীবনের অসারতার কথা ভাবতে লাগলাম। কত ক্ষণস্থায়ী পরমায়ু আমাদের? পরের মুহূর্তে কি হবে বলা যায় না।

পুরানো ধরনের বাড়ি। অরবিন্দর ঠাকুর্দার আমলের। এর মধ্যে খুব যে সংস্কার হয়েছে এমন মনে হয় না। বাড়ির সামনে দাঁড়ালেই মনে হয় বাড়িটা ঘিরে শোকের বলয়। কেমন থমথমে ভাব।

আস্তে আস্তে কড়া নাড়লাম। কাজ হল না। জোরে শব্দ করতে সঙ্কোচ হল, কিন্তু উপায় নেই, জোরে কড়া নাড়লাম।

একজন ভৃত্য এসে দরজা খুলতে জিজ্ঞাসা করলাম, "সুরজিৎ আছে?" সুরজিৎ অরবিন্দের সেজ ভাই। আমার একদার সহপাঠী।

—"আছেন। বসুন।"

বাইরের ঘরে চেয়ারে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে সুরজিৎ ঘরে ঢুকল। কোঁচার খুঁট গায়ে জড়ানো বিষণ্ণ, নিষ্প্রভ চেহারা।

বললাম, "আজ সকালে কাগজে দেখে সব জানতে পারলাম।"

সুরজিৎ আমার পাশের চেয়ারে বসল।

আস্তে আস্তে বলল, আশ্চর্য কাণ্ড। টাকা পয়সা কিছু নেয়নি। শুধু প্রাণটার ওপরই যেন লোভ ছিল। পুলিশও কিছু কিনারা করতে পারছে না।

জিজ্ঞেস করলাম, "অরবিন্দর স্ত্রী জয়া কি বলে? সে পুলিশের কাছে লোকটার বর্ণনা দিতে পারছে না?"

কিছুক্ষণ সুরজিৎ কোন কথা বলল না। চুপ করে রইল। একটু পরে নিজের মনেই যেন বলতে লাগল, "জয়ার মাথার গোলমাল হয়েছে।"

—"মাথার গোলমাল?"

—"আশ্চর্য কি। জানিস তো আমাদের বাড়ির ব্যাপার। যত সেকেলে ধারণা। পুরনো মত। বুড়ো বুড়িরা সবাই বলছে, জয়া নাকি খুব অপয়া। তা না হলে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী যায়। জয়া খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিনরাত কান্নাকাটি করছে। কত করে বললাম, বাপের বাড়ি ঘুরে এস, বাপ নিতে এল, তবু গেল না।

হাওড়া স্টেশনে দেখা জয়ার চেহারাটা মনে পড়ল।

হঠাৎ সুরজিৎ জিজ্ঞাসা করল, "তোর সঙ্গে জয়ার দেখা হয়েছে? জয়া তোর কথা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল।"

—"হ্যাঁ, হাওড়া স্টেশনে পুরী যাবার সময়ে একবার দেখা হয়েছিল। কিন্তু জয়া আমার কথা কি জিজ্ঞাসা করছিল?"

—"বলছিল, তোকে একবার খবর দিতে।"

—"আমাকে?" আমি রীতিমত বিস্মিত হলাম। "আমাকে কেন?"

—"কি জানি। এসেছিস যখন, একবার দেখা করে আয় না।"

—"দেখা করব?" একটু দ্বিধাবোধ করলাম।

সুরজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাল, "হারু, হারু।" ছোকরা চাকর এসে দাঁড়াল।

সুরজিৎ বলল, "এই বাবুকে ছোট বৌদিমণির ঘরে নিয়ে যাতো।"

—"আসুন বাবু।"

হারুর পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। কোণের ঘরের দরজার সামনে মেরুন রংয়ের ভারি পর্দা। দরজা ভেজানো।

খুব আস্তে দরজায় ঠুক ঠুক করলাম। অনেক পরে ভিতর থেকে ক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর এল।

"কে?"

নাম বললাম। দরজা খুলে গেল।

"আসুন।"

পরনে কালো পাড় শাড়ি, অবিন্যস্ত চুল, হাতে একটি করে চুড়ি। এত দ্রুত যে একটা মানুষের

চেহারা এত বদলে যেতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

মাঝখানে গোল টেবিল। তার ওপর অরবিন্দর একটা ফটো। জয়া খাটের একপাশে বসল। আমি চেয়ারে বসে প্রশ্ন করলাম, "তুমি নাকি আমাকে খুঁজছিলে।"

—হ্যাঁ দাদা"

—"কেন?"

—"ওঁর একবার বেলা বলে কোন মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল?"

—"সে তো অবিবাহিত ছেলে আর কুমারী মেয়ে থাকলে কত হয়?"

—"মেয়েটি দেখতে কালো।"

—"হ্যাঁ।"

—"মনের দুঃখে মেয়েটি কি আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল?"

—"কে বললে? অরবিন্দ?"

—"না, আমি কাগজে পড়েছি। উনি বলেছিলেন, সে অন্য মেয়ে, তখন আমি তাই বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু এখন আমি ঠিক জানি এ সেই মেয়ে।"

—"কেন একথা বলছ কেন?"

—"এ বাড়িতে আমি বলেছি, কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেনি। আপনাকে বলি শুনুন।"

—"রাত তখন এগারোটা। আপনার ভাই ঘুমাচ্ছে। আমি বাথরুমে যাব বলে উঠতে গিয়েই চমকে উঠলাম। সামনের বেঞ্চে ঘোমটা দেওয়া একটি বৌ। এ কি করে সম্ভব! দুটো দরজাই লক করা। বৌটি কি করে উঠল। কে? কে তুমি? এ কামরায় উঠলে কি করে? আমার চীৎকারে আপনার ভাই উঠে পড়ল।

—কি, কি হল? ঘুম জড়ানো কণ্ঠে আপনার ভাই জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, এই দেখ না ওই বেঞ্চে কে বসে আছে।

যাও, নিকালো, নিকালো—আপনার ভাই তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বৌটি ঘোমটা ফেলে দিল, মুখটা দেখলে মনে হয় আগুনে পোড়া। মাংস পুড়ে আঙুরের গুচ্ছের মতন হয়ে আছে। দুটো চোখ চক চক করে উঠল। শাড়ির মধ্য থেকে দুটি কঙ্কাল হাত বেরিয়ে আপনার ভাইয়ের গলা সজোরে টিপে ধরল। বিকট একটা হাসি। মনে হল কামরার জানলাগুলো থর থর করে কেঁপে উঠল। আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরে এল দেখলাম—লোকটা মেঝেয় পড়ে।

বৌটা কোথাও নেই। চেন টেনে ট্রেন থামালাম। তারপর ঘটনাটা গার্ডের কাছে, পুলিশের কাছে বাড়ির লোকের কাছে বলেছি। কেউ বিশ্বাস করেনি। সকলের ধারণা শোকে আমার মাথা খারাপ হয়েছে। আপনি তো বেলার পাশের বাড়িতে থাকতেন, সবকিছু আপনার জানা বলুন, বেলা ছাড়া কে আমার এ সর্বনাশ করবে। মৃত্যুর পরেও কে আসবে প্রতিহিংসা নিতে বলুন?"

কি বলব। বলবার মতন কোন উত্তর সেদিন খুঁজে পাইনি। আজও পাই না।

বনকুঠির রহস্য

চিঠিটা পেয়ে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বছর দশেক তো হবেই, মানে কলেজ ছাড়ার পর থেকে সুকুমারের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। শুনেছিলাম ওড়িশার এক জঙ্গলে কাঠ কেটে চালান দিচ্ছে। ব্যবসায় বেশ দু'পয়সা করেছে। কলকাতায় সে আসেই না।

চিঠিতে লেখা, ভাই আমার বড় বিপদ, তুই আমাকে বাঁচা। যত তাড়াতাড়ি পারিস আয়। কটকে নেমে ট্যাক্সিতে সারানার জঙ্গলে চলে আসবি। আমার বাংলোর নাম বনকুঠি। যাকে জিজ্ঞাসা করবি সেই দেখিয়ে দেবে। আসিস ভাই। তোর আশায় রইলাম। ইতি সুকুমার।

চিঠিটা পেয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। কী এমন বিপদ হতে পারে সুকুমারের? ব্যবসার জন্য যদি টাকার দরকার হয়ে থাকে তাহলে আমি আর কী সাহায্য করতে পারি। আমার সামান্য চাকরি। একলা মানুষ তাই কোনোরকমে চলে যায়।

তবে কি ওখানকার মজুরদের সঙ্গে কোনরকম গোলমাল বাধল? তাহলেই বা আমি কী করতে পারি।

যাই হোক, বিপদ যখন লিখেছে তখন একবার যাওয়া দরকার।

অফিস থেকে দশদিনের ছুটি নিয়ে বের হয়ে পড়লাম।

কটকে নামলাম সন্ধ্যা ছটায়। স্টেশনে অনেক ট্যাক্সি রয়েছে, কিন্তু সারানার জঙ্গলে যেতে কেউ রাজি নয়।

যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে যেতে চার ঘন্টা লেগে যাবে। ফেরার সময় অত রাতে বিপদ

আছে। খুব চিতাবাঘের উপদ্রব। দু'একজন বলল, রাতটা ওয়েটিংরুমে কাটিয়ে সকালেই যাবেন।

ভেবে দেখলাম সেটাই ঠিক হবে। নতুন জায়গায়, বিশেষ করে জঙ্গলে রাতে না যাওয়াই ঠিক।

ওয়েটিংরুমে রাতটা কাটিয়ে সকালে ট্যাক্সি ধরলাম, শহর ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা যাবার পর জঙ্গলের এলাকা শুরু হল। বড় বড় শাল আর কেঁদ গাছ। ঘন লতার ঝোপ। সূর্যের আলো বন্ধ। দিনের বেলাতেই আবছা অন্ধকার। একটু এগিয়েই ট্যাক্সি থেমে গেল। আর পথ নেই।

"কী হল?"

"আর রাস্তা নেই। আপনাকে হেঁটে যেতে হবে।"

"সারানা জঙ্গল কত দূর?"

"এই তো শুরু হল," ট্যাক্সি ড্রাইভার আঙুল দিয়ে একটা ফলকের দিকে দেখিয়ে দিল। তাতে লেখা সারানা জঙ্গল।

জিজ্ঞাসা করলাম, বনকুঠি কতটা দূর হবে?

"তা বলতে পারব না। আপনি নেমে খোঁজ করুন।"

"অগত্যা ভাড়া মিটিয়ে কাঁধে ঝোলা আর হাতে সুটকেস নিয়ে নেমে পড়লাম।"

সরু পায়ে চলা পথ। ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে এল। ঝিঁঝির একটানা শব্দ, নাম না জানা পাখির করুণ ডাক, বাতাসে পাতা কাঁপার শিরশিরানি আওয়াজ। এই অজগর জঙ্গলে সুকুমার থাকে কি করে? অর্থের জন্য মানুষ বুঝি সব কিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়।

বেশ কিছুটা যাবার পর জনতিনেক কাঠুরিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সকলের হাতেই কুড়াল। ঝুড়িগুলো টুপির মতন মাথায় পরেছে।

তাদের প্রশ্ন করলাম, "বনকুঠি কোন্ দিকে?"

তারা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করল, কয়েকবার আমার আপাদমস্তক দেখলে, তারপর একজন বলল, "বনকুঠি সোজা ডানদিকে, পুকুরের পাশে।"

চলতে চলতে লক্ষ্য করলাম কাঠুরিয়ারা একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। গভীর জঙ্গলে নতুন লোক দেখে তাদের কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক। একটু পরে ঝোপের আড়ালে আর তাদের দেখা গেল না। সোজা হাঁটতে লাগলাম। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গিয়েছে। শহুরে লোক, এতটা হাঁটা অভ্যাস নেই। পা দুটো টন-টন করছে। একটু এগোতেই পুকুর দেখা গেল। পুকুর নয়, বিরাট ঝিল। জল দেখা গেল না। পদ্মপাতায় ভর্তি।

তার পাশেই একটা বাংলো। একতলা। চারপাশের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলোর রঙও সবুজ। ছোট গেট। গেটের উপর একটা লতা উঠেছে। তাতে বেগুনি রঙের থোকা-থোকা ফুল, চমৎকার বাংলো। পথের কষ্ট যেন নিমেষে মুছে গেল।

গেটের কাছ বরাবর গিয়ে নজরে পড়ল, একটা কাঠের ওপর সবুজ রং দিয়ে লেখা, বনকুঠি।

গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। দরজায় তালা ঝুলছে। তার মানে সুকুমার নেই। বেরিয়েছে। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। সুটকেস আর ঝোলা পাশে রেখে

দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। বেশ ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল, ঘড়ি দেখে চমকে উঠলাম। দু' ঘন্টা পার হয়ে গেছে। তখনও দরজায় তালা ঝুলছে। বুদ্ধি করে ঝোলার মধ্যে পাউরুটি আর কলা এনেছিলাম। কটক স্টেশন থেকে ফ্লাস্কে গরম চা ভরে নিয়েছিলাম। আপাতত তাই খেয়ে প্রাণ বাঁচালাম।

নেমে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। সব জানলা বন্ধ। সেটাই স্বাভাবিক। এই ঘন জঙ্গলে কেউ জানলা খুলে বাইরে যায় না। জানলা দিয়ে বাইরে থেকে সাপ খোপের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ার ষোলআনা সম্ভাবনা।

আরও দু' ঘন্টা কাটল। সুকুমার কলকাতায় চলে গিয়েছে। আমি যে আসবই, সেটা তো তার জানবার কথা নয়। তবু চিঠি যখন আমাকে দিয়েছে, তখন তার দু'একদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল। দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। খুব কম-দামি মরচে পড়া তালা ঝুলছে। জোরে কয়েকবার টানতেই তালাটা খুলে এল। বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। একটা খাট, বিছানা পাতা। একপাশে আলমারি। বোধ হয় কাপড় জামা রাখার। একটা গোল টেবিল, একটা চেয়ার।

খিদেয় চোখে অন্ধকার দেখছি। ছুটে রান্নাঘরে গেলাম। একটা জালের মিটসেফ। খুলতেই দেখলাম, চাল, ডাল, আলু আর ডিম রয়েছে। নীচে একটা স্টোভ। রান্না করার অভ্যাস আমার ছিল। একসঙ্গে চাল ডাল চড়িয়ে দিলাম। তার মধ্যে আলুও ছেড়ে দিলাম। দুটো ডিমও ভাজলাম।

খাওয়া সেরে নিলাম। সুকুমারের জন্য খিচুড়ি আর ডিমভাজা আলাদা করে রেখে দিলাম।

তারপর সোজা শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম, জানি না, খুটখাট শব্দ হতে উঠে বসলাম। দরজার ওপারে বিশ্রী একটা মুখ দেখা গেল। খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। খুদে লাল চোখ। পরনে ছেঁড়া শার্ট আর প্যান্ট।

চেঁচিয়ে উঠলাম, "কে?"

লোকটা ভিতরে এসে বলল, "আপনি কে? বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন কি করে?"

তার কথায় উত্তর না দিয়ে বললাম, "তুমি কে, আগে তাই বলো?

"আজ্ঞে, আমি এ বাড়ির দেখাশোনা করতাম। রান্না, বাসনমাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া সব।"

"আমি সুকুমারের বন্ধু। সুকুমার কখন আসবে? আমি ভোর থেকে অপেক্ষা করছি।"

লোকটার ভাঙাচোরা মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল। দুটো চোখ বিস্ফারিত, আমার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "কে আসবে? বাবু? মরা মানুষ কি ফিরে আসে?"

কথাটা কানে যেতেই লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালাম।

"কে মরা মানুষ? কী যা-তা বলছ?"

"আপনি শোনেনি কিছু? নিজের দোষে বাবু মরণ ডেকে আনল।"

মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। সুকুমার নেই। যে বিপদের ভয়ে সে আমাকে চিঠি লিখে আসতে বলেছিল, সেই বিপদই বুঝি তাকে গ্রাস করল। আমার কি আসতে দেরী হয়েছে? কী লজ্জা, বন্ধুর প্রাণ বাঁচাতে পারলাম না। লোকটাকে বললাম, "সব ব্যাপারটা খুলে বলো তো।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

লোকটা মেঝের ওপর বসল। খুব নিচু গলায় বলতে শুরু করল, "বাবু তো কাঠের কারবার করতেন, জঙ্গলের একেবারে শেষের দিকে একটা গাছ আছে। সেটাকে আমরা তোঙ্গা গাছ বলি। সে গাছ কেউ কাটে না। তাতে অপদেবতার বাস। কাঠুরিয়ারা কেউ সে গাছ কাটতে রাজি হল না। সবাই চলে এল জঙ্গল থেকে, কিন্তু বাবু নাছোড়বান্দা। বললো, এ জঙ্গলের সব গাছ আমি ইজারা নিয়েছি, কোন গাছ আমি ছাড়ব না।" বাবু কুড়াল নিয়ে নিজেই তার ডাল কাটতে শুরু করলেন, গোটা তিনেক ডাল মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কাটা জায়গা দিয়ে রক্তের মতন আঠা ঝরতে লাগল। আমি জোর করে বাবুকে টেনে বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। তারপর—"

"কী তারপর?"

"পরের দিন ভোরে এসে দেখি সদর দরজা খোলা। বাবু মেঝের ওপর পড়ে আছেন। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বের হচ্ছে বাবুকে কেউ গলা টিপে মেরে ফেলেছে। বাবুর হাতের মুঠোয় তোঙ্গ গাছের ছোট একটা ডাল।" বললাম, তার মানে সুকুমারকে ডাকাতে মেরে ফেলেছে।"

"না বাবু, এখানে চোরডাকাত নেই। এত গভীর জঙ্গলে কে আসবে ডাকাতি করতে। ডাকাত হলে বাবুর টাকাকড়ি, জামাকাপড় নিয়ে যেত না? কিচ্ছু কেউ ছোঁয়নি। তাছাড়া বাবুর আর এক হাতের মুঠোয় একটা কাগজ ছিল। তাতে লেখা, তোঙ্গা বাবার কোপ থেকে আমাকে বাঁচাও। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তোঙ্গাগাছের শক্ত ডাল আমার গলা চেপে ধরেছে। উঃ।"

"কাগজটা কোথায়?"

"এই যে বাবু।" লোকটা উঠে রান্নাঘরে গিয়ে একটা হাঁড়ির মধ্যে থেকে ডায়েরির একটা ছেঁড়া পাতা নিয়ে আমার হাতে দিল।

লোকটা যা বলেছিল সেই সবই কাগজে লেখা রয়েছে। সুকুমারেরই হাতের লেখা।

জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি বাংলা পড়তে পার?"

"বলতে পারি বাবু, পড়তে পারি না।"

"তবে এ লেখা পড়লে কী করে?"

"আমি পড়িনি বাবু। পুলিশের লোক এসেছিল খবর পেয়ে। তাদের মধ্যে একজন বাংলা জানত, সেই পড়ে শুনিয়েছিল। কাগজটা আমার হাতে ফেরত দিয়ে বলেছিল, যত সব আজগুবি কাণ্ড।"

কথাটা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। সব ব্যাপারটা কেমন রহস্যজনক। অলৌকিক ব্যাপারে আমার মোটেই বিশ্বাস নেই। "কতদিন আগে এটা হয়েছে?"

লোকটা হিসাব করে বলল, "তা দিন পনেরো তো হবেই।"

"মিথ্যে কথা, ধমক দিয়ে উঠলাম। "দিন পাঁচেক আগে সুকুমার আমাকে চিঠি দিয়েছিল। এই দেখ সেই চিঠি।" পকেট থেকে পোস্টকার্ডটা লোকটার দিকে এগিয়ে দিতে গিয়েই চমকে উঠলাম। পোস্টকার্ডে একটি আঁচড়ও নেই। কেবল লাল লাল ছোপ।

সুকুমারের গলায় যে ধরনের লাল দাগের কথা লোকটা বলেছিল, অনেকটা বুঝি সেই ধরনের।

মূর্তির কবলে

একেবারে আচমকা। তাও অন্য কোন বড় শহর হলে এক কথা। আপসোস করার বিশেষ কিছু থাকত না। কিন্তু বদলি করলে কলকাতা থেকে এলোর। অন্ধ্রদেশে। ইংরাজ আমলে ওই নাম ছিল এখন স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে নাম হয়েছে এলুরু।

একটা আশার কথা বিয়ে থা করিনি। বৌ ছেলেপুলের বালাই নেই। ঝাড়া হাত পা।

কাজেই তল্পিতল্পা বেঁধে ট্রেনে উঠলাম।

স্টেশনে রামকৃষ্ণ রাও ছিলেন। এঁর জায়গাতেই আমি যাচ্ছি। ইনি বদলি হচ্ছেন কোয়েম্বাটুর। এঁকে থাকবার একটা আস্তানার সন্ধান করতে বলেছিলাম। বিদেশ বিভুঁই, কিছুই জানা নেই। অন্তত মাথা গোঁজবার একটা জায়গা থাকা দরকার।

করমর্দন পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসার পর প্রশ্ন করেছিলাম আমার থাকার কি ব্যবস্থা হবে?

রামকৃষ্ণ প্রশান্ত হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই আপনি থাকতে পারবেন। বাড়ীওয়ালা খুব সদাশয়, বাড়ীটাও যথেষ্ট খোলামেলা।

যেতে যেতে রামকৃষ্ণ বললেন, আমি এখানে একলাই থাকতাম। বদলির চাকরির জন্য স্ত্রীপুত্রকে মামার বাড়ী মাদ্রাজে রেখে দিয়েছি।

তারপর হঠাৎ থেমে রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার নিজের হাতে রান্না করার অভ্যাস আছে?

বিশেষ নেই, তবে কলকাতায় ঝি না এলে মাঝে মাঝে নিজেকেই চালিয়ে নিতে হ'ত।

ওই এক মুস্কিল। এখানকার রান্না খেতে আপনাদের মানে বাঙালিদের হয়তো অসুবিধা হবে। সবই নারকেল তেলে রান্না কিনা?

আর কিছু বললাম না। অদৃষ্টে দুর্ভোগ আছে জানি। বাড়ীটা বেশ পছন্দসই। চারপাশে একটু বাগান আছে। নারকেল আর কিছু আমগাছ। রান্না করার লোক একটা জুটে গেল। শঙ্করন। সে শুধু ভাত রেঁধে দিয়ে যাবে। মাছ, মাংস, ডিম ছোঁবে না। ওগুলো আমাকেই করে নিতে হ'ত।

রামকৃষ্ণ যাবার সময় একটি জিনিস দিয়ে গেলেন। টেরাকোটার মূর্তি। লাল রঙের। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম নটরাজের মূতি। কিন্তু ভাল করে দেখলাম, না, নটরাজ নয়, সেই ধরণের ভঙ্গী। মুখ চোখের চেহারা বীভৎস! চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা।

রামকৃষ্ণ বললেন, কি মূর্তি জানি না। হরিদ্বারে এক সাধুর কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন কাল ভৈরবীর মূতি। রোজ শুতে যাবার আগে এ মূর্তিকে প্রণাম করে শুলে মঙ্গল হবে, অবহেলা করলে অশুভ।

এসব ব্যাপারে আমার ভক্তি শ্রদ্ধা একটু কম। বরং বলা যায়, আমি কিছুটা নাস্তিক। নিজের পুরুষকার ছাড়া আর কিছু মানি না। তবু রামকৃষ্ণের মুখের ওপর আমি কিছু বলি নি। বলতে পারি নি। মূর্তিটা নিয়ে আলনার ওপর রেখে দিয়েছিলাম। এলুরুর চারপাশে তামাকের খেত। আমার কাজ এই সব তামাক পরিদর্শন করা। একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তামাকে যাতে পোকা না লাগে, লাগলে তার প্রতিষেধক কি, তারপর কি ভাবে তাকে গুদাম জাত করে রপ্তানীর উপযোগী করা যায়, সে বিষয়ে নির্দেশ। অনেক দিন আমাকে গ্রাম অঞ্চলেই কাটাতে হ'ত। তখন শঙ্করণ থাকত বাড়ীর তদারকিতে।

একেবারে নিস্তরঙ্গ জীবন। সংস্কৃতির ছিটেফোঁটা কোথাও নেই।

কি আর করা যাবে। কটা লোক আর জীবন আর জীবিকা মেলাতে পারে। মাস খানেক পর মুস্কিলে পড়লাম। শঙ্করণ এল না। এই সময় বর্ষার খুব প্রকোপ। চারদিকে ম্যালেরিয়া। দিন পনের শয্যাগত করে রাখে। নিরুপায়, নিজেকেই হাত পুড়িয়ে রান্না-বান্না করতে হয়। কাজ বিশেষ নেই। রাত আটটার মধ্যে শুয়ে পড়ি।

বাইরে বৃষ্টির নুপূর আর ব্যাঙের আলাপ জলসার আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে।

শোয়া মাত্র চোখে ঘুম নেমে এল। রাত কত খেয়াল নেই। হঠাৎ ধড়মড় করে বিছানার ওপরে উঠে বসলাম। মশারিতে আগুন ধরে দাউ দাউ করে জ্বলছে। কি আশ্চর্য, কি করে এটা হল।

বেড সুইচ নেই। ঘরের আলো বন্ধ করে তবে আমি শুয়েছি। কারণ আলো থাকলে আমি ঘুমোতে পারি না। ভীষণ বিপদে পড়ে গেলাম। মশারির চারিদিক জ্বলে উঠছে। নাইলনের মশারি। নামবার কোন পথ নেই। আগুনের তাপ আমার শরীর ঝল্‌সে দিচ্ছে। চেঁচাবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। আর চেঁচিয়েও কোন লাভ নেই। সব চেয়ে কাছে যে বাড়ী সেটাও আধ মাইল দূর।

বিদেশে এভাবে কি পুড়ে মরতে হবে। মরিয়া হয়ে নামবার চেষ্টা করলাম। এ ছাড়া উপায় নেই। একটু এগিয়ে থেমে গেলাম। সেই অগ্নিশিখার পিছনে বিরাট এক মুর্তি। শুধু বিরাট নয়, বিকটও।

কালভৈরবীর মূর্তি। দুটি চোখে অগ্নিপিণ্ড। ঠোঁটের দুপাশে আগুনের ঝলক। ভাবলাম ভুল দেখছি। চোখদুটো ভাল করে রগড়ে নিলাম। কিন্তু না, একদৃশ্য। কালভৈরবীর মূর্তি যেন জীবন্ত হয়েছে।

এদিকে আগুনের উত্তাপ বাড়ছে। বিছানার ওপর বসে থাকা আর সম্ভব নয়। লাফিয়ে মেঝের ওপর পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে আগুণ যেন মিলিয়ে গেল। কালভৈরবীর মূর্তিও উধাও। কিন্তু আর একটা আশ্চর্য কাণ্ড।

একটা অদৃশ্য টানে কে যেন আমাকে আলনার দিকে নিয়ে গেল। আলনার কাছে গিয়েই অবাক হলাম। কালভৈরবীর মূর্তিটা নেই। শঙ্করণ মূর্তিটা আলনার ওপর একটা তাকের মধ্যে রাখত।

মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি সে মূর্তির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছে।

আমি নিজে এসব না মানলেও কারও ধর্মবিশ্বাসে বাধা দিতে চাই নি।

পিছন ফিরে দেখলাম, মশারির অবস্থা স্বাভাবিক। আগুনের সামান্য চিহ্নও কোথাও নেই। নিজের ওপর রাগ হল। নিশ্চয় বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্ন দেখে এতটা ভয় পাওয়া নিঃসন্দেহে ছেলেমানুষি। কিছুক্ষণ পায়চারি করে শুতে গেলাম। ভোরের দিকে একই কাণ্ড।

এবারে কালভৈরবীর মূর্তি দুটির নাসারন্ধ্র দিয়ে আগুনের হলকা। মশারি পুড়ছে। আগের বারের মতন লাফ দিয়ে নীচে নামতে সব স্বাভাবিক। আর বিছানায় যাই নি। আলো ফোটা পর্যন্ত বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসে রইলাম। শেষ রাত্রের দিকে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল।

আকাশ প্রায় পরিষ্কার ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের আভাস।

শঙ্করণ এসে হাজির। জ্বর নেই, তবে চেহারা বেশ কাহিল। একবারে ভাবলাম শঙ্করণকে কিছু বলব না। আমার সম্বন্ধে তার ধারণা খারাপ হবে। ভাববে, আমি অহেতুক ভয় পেয়েছি। কিন্তু তাকে অন্যভাবে জিজ্ঞাসা করলাম। আচ্ছা শঙ্করণ, সেই কালভৈরবীর মূর্তিটা কোথায় জান?

কালভৈরবীর মূর্তি! কেন, তাকের ওপর নেই?

শঙ্করণ ছুটে এল ঘরের মধ্যে। তাক খালি। মূর্তি নেই। লক্ষ্য করলাম, শঙ্করণের মুখ পাংশু, নীরক্ত হয়ে গেল। এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলো। তাইতো, কোথায় গেল? আপনি ফেলে দেন নি তো?

আমার ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপর শঙ্করণের মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না। সে আমার হাল চাল দেখে হয়তো কিছুটা মালুম করেছে।

আমি বললুম, মূর্তি সম্বন্ধে আমি কোনই খোঁজ রাখি না। তুমিই তো দেখা শোনা করতে।

শঙ্করণের আমার কথার উত্তর দেবার অবকাশ নেই। সে তন্ন তন্ন করে মূর্তিটা খুঁজছে। আলনাটা সরিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠল। এই তো এখানে পড়ে রয়েছে। দেখলাম দুজোড়া জুতোর ফাঁকে মূর্তিটা পড়ে আছে। শঙ্করণ সন্তর্পণে মূর্তিটা তুলে নিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলল, এটা এখানে কে ফেলল?

উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম না। চুপ করে রইলাম। শঙ্করণ মূর্তিটা কাপড় দিয়ে ভাল করে মুছে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল। নতজানু হয়ে মূর্তির সামনে বসে বিড় বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করল। মাস খানেক একভাবে গেল। কোন উপদ্রব নেই।

কলকাতা থেকে একটা চিঠি এল। বন্ধু অসিতের লেখা।

অসিত শুধু আমার মামুলি বন্ধুই নয়, কলেজে আমরা অভিন্ন হৃদয় ছিলাম। অসিত বম্বেতে এক কাপড়ের কলের টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ার। সে লিখেছে, দু মাসের ছুটিতে কলকাতা এসেছে। এসে ভাল লাগছে না, কারণ আমি কলকাতায় নেই। তার খুব ইচ্ছা আমার কাছে মাস খানেক কাটিয়ে যাবে। প্রস্তাবটা খুব ভাল লাগল। পাণ্ডববর্জিত দেশে অসিতের মতন বন্ধু পাশে থাকলে সময়টা ভালই কাটবে। পত্রপাঠ তাকে আসতে লিখে দিলাম। চিঠি লেখার সাত দিনের মধ্যে এসে হাজির। এলুরু ষ্টেশন থেকে তাকে ট্যাক্সি করে নিয়ে এলাম। বাড়ী দেখে অসিত বেজায় খুশী।

সব কিছুতেই তার দারুণ উৎসাহ। বিন্দুতে সিন্ধুর স্পর্শ পেল!

বা, এযে একেবারে বাগানবাড়ী রে? শহর অথচ শহরের গোলমাল নেই। বেশ আছিস।

চা খেতে খেতে হঠাৎ তার দৃষ্টি মূর্তির দিকে গেল। জিজ্ঞাসা করল, ওটা কিসের মূর্তি রে?

কালভৈরবীর।

সেটা আবার কি?

চা শেষ করে অসিত মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখে বলল, বাড়ীর মধ্যে এই কিম্ভূত কিমাকার মর্তিটা রেখেছিস কেন? ফেলে দে।

শঙ্করণ ওই মূর্তিটা রোজ পূজা করে, তাই আর সরাইনি। নাহলে ও মোটেই আমার পছন্দসই নয়।

শঙ্করণ পছন্দ করে তো এটা সে তার বাড়িতে নিয়ে যাক, কিংবা রান্নাঘরে, তার কাজের জায়গায় রাখুক। তোকে তো নাস্তিক বলেই জানতাম অন্তত মূর্তি পূজার বিরোধী।

কিছুই বললাম না। কিই বা বলব। অসিত আমার মনের কথাই বলেছে। আমার ঠিক পাশের ঘরটা তার শোবার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। দুটে দরজার মাঝখানে একটা দরজা ছিল। বেশ কিছুটা রাত গল্পগুজব করার পর অসিত শুতে গিয়েছিল। আমার ঘুম আসে নি। টেবল-ল্যাম্প জ্বেলে টোবাকো কিওরিং সম্বন্ধে একটা বই পড়লাম, তারপর শুতে গেলাম।

বোধহয় মাঝরাত, ঠিক খেয়াল নেই। পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দ। অনেকগুলো লোক যেন দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে!

একবার মনে হল ডাকাত পড়েছে। তারপর ভাবলাম ডাকাতদের তো এই ঘরের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। পাশের ঘরের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। পাশের ঘরে ঢোকবার আলাদা কোন রাস্তা নেই। সারা ঘর জুড়ে তাণ্ডব নৃত্য চলেছে অথচ অসিতের কোন শব্দ নেই। তবে কি তার কোন বিপদ ঘটল। উঠে পড়লাম। দরজার পাশে গিয়ে দেখলাম, অসিত পাশের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছে। হাত রাখতেই দরজাটা খুলে গেল। শব্দ চলছে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

শুধু অসিতের মশারীটা প্রবল বাতাসে উড়ছে। অথচ আজ গুমোট। বাতাস একেবারেই নেই।

অসিত, অসিত। বার কয়েক চেঁচালাম। কোন উত্তর নেই।

বাইরে ম্লান চাঁদের আলো। জানলা দিয়ে সেই আলো অসিতের বিছানার ওপর এসে পড়েছে। অস্পষ্ট অসিতের কাঠামো দেখা গেল। সে শুয়ে রয়েছে। সন্দেহ হ'ল, ভুতুড়ে বাড়ী নয় তো? শব্দ

আসছে কোথা থেকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিজের বিছানায় ফিরে এলাম। তারপর এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। অসিতের সঙ্গে দেখা হল, পরের দিন চায়ের টেবিলে। আমি কিছু বলবার আগেই অসিত বলল। না ভাই, দু'বেলা মাংস আমার সহ্য হচ্ছে না। পেট গরম হয়। রাত্রে যা সব স্বপ্ন দেখি।

কি স্বপ্ন দেখলি?

আর বলিস কেন? কাল মাঝরাতে দুপদাপ শব্দ। একপাল লোক, হাতে ত্রিশুল, আমার বিছানা ঘিরে প্রলয় নাচ নেচে চলেছে, যেখানে পা ফেলছে সেখানেই আগুন জ্বলে উঠছে। আর এমন মজা সেই আগুনের আঁচ লাগছে আমার সারা দেহে। ওঠবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না।

অসিতের দিকে দেখলাম, তার চেহারা খুব-ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত মনে হল কালভৈরবীর মূর্তির কথাটা বলতে গিয়েও বললাম না। চা পান শেষ করে আমি আমার শোবার ঘরের তাকের কাছে গিয়েই চমকে উঠলাম। তাক খালি। মূর্তি নেই। সর্বনাশ, মূর্তিটা আবার গেল কোথায়।

আলনা, সুটকেশ, জিনিসপত্র, সরিয়ে খুঁজতে আরম্ভ করলাম। মূর্তি কোথাও নেই। এই সময় শঙ্করণ ঘরে ঢুকল। উস্কোখুস্কো চুল, মলিন মুখ, উদভ্রান্ত দৃষ্টি। হাতে কালভৈরবীর মূর্তি।

স্যার, আপনার এখানে কাজ করে আমার পোষাবে না। আমাকে ছুটি দিয়ে দিন।

কি হল?

শঙ্করণ কালভৈরবীর মূর্তিটা তুলে ধরে দেখিয়ে বলল, এই মূর্তিটাকে রান্নাঘরের কোনে ময়লা ফেলার ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছিল। আপনারা আমিষ ভোজী বিধর্মী। ঠাকুর দেবতা হয়তো মানেন না, কিন্তু কালভৈরবী একেবারে কাঁচাখেকো দেবতা। কাউকে রেহাই দেবেন না।

শঙ্করণ চলে গেলে, আমি খুবই মুস্কিলে পড়ব।

তাই বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম এ মূর্তি এখান থেকে সরাল কে?

কে সরাল শঙ্করণ ভাল করেই জানত। যে সরিয়েছে সে কোন লুকোচুরি করেনি। তাই অসিতের ঘরের দিকে চোখের ইঙ্গিত করে শঙ্করণ বলল। আর কে সরাবে, আপনার বন্ধু! ঠাকুর দেবতা নিয়ে খেলা করতে বারণ করে দেবেন। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ঠিক আছে, তুমি কাজ করগে যাও। অসিতকে আমি বলে দেব। শঙ্করণ চলে গেল।

সেদিন বিকালে অসিতের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে কথাটা বললাম। চিন্তা ধারার দিক দিয়ে আমার সঙ্গে অসিতের কোন অমিল ছিল না। দুজনের একই ধরণের বিশ্বাস। সেই কলেজের দিন থেকে। একটা রাতের অভিজ্ঞতাকে আমি মোটেই আমল দিই না। সে রাতের স্বপ্নের সঙ্গে ওই কালভৈরবী মূর্তির কোন যোগাযোগ আছে, আমি মনে করি না।

কিন্তু শঙ্করণের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানলে সে হয়তো এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। এ বিদেশ, বিভুঁয়ে আমি বিপদে পড়ব! তাই অসিতকে বললাম, অসিত আমার একটা কথা শুনবি?

বল।

তুই তো আর দিন দুয়েক আছিস, এর মধ্যে কালভৈরবী মূর্তি নিয়ে আর গোলমাল করিস না।

অসিত কোন উত্তর না দিয়ে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে আমার আপাদ মস্তক জরিপ করল।

এদেশের লোকরা খুবই ধর্মভীরু হয়। অনেকটা আমাদের দেশের লোকদের মতন। পাথর কুটি গাছপালা সব কিছুতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করে আনন্দ পায়। ওই কালভৈরবীর মূর্তিটাকে তুই অবহেলা আর তাচ্ছিল্য করলে শঙ্করণ আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তারপর কোন লোক আর আমার কাছে কাজ করতে আসবে না। আমার কি অসুবিধা হবে বুঝতে পারছিস?

একটু চুপ করে থেকে অসিত উত্তর দিল, তোর এমন অধঃপতন হবে ভাবতে পারি নি। দরকার হলে কলকাতা থেকে লোক নিয়ে আয়। নিজের চিন্তার স্বাতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এভাবে বিসর্জন দিস না।

তুই পাগল হয়েছিস অসিত। কলকাতা থেকে কে আসবে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায়? বেশী টাকার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এলেও কিছুদিন পর পালাবে। তাছাড়া এদেশের লোক আমাকে বয়কট করবে। শঙ্করণের মারফত কথাই চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়বে।

ঠিক আছে, তোর কথাটা শুনে রাখলাম।

অসিত চাপা সুরে কথাগুলো বলল। কিন্তু তার মুখ চোখের চেহারা আমার ভাল লাগল না। কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নেবার সময় এইভাবে সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে তার কপালে অজস্র বাড়তি আঁচড় পড়ে। আর কোন কথা হল না। দুজনে বাড়ী ফিরে এলাম। মনে পড়ে গেল, কলেজ জীবনে দুজনে চার্বাকের উদ্ধৃতি তুলে কিভাবে প্রতিপক্ষকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছি। ঈশ্বর নেই বা আছে তা প্রকৃতি। এই প্রকৃতির স্বাক্ষরই আমরা দেখতে পাচ্ছি। পরের দিন মাইল চারেক দুরের এক গ্রামের মধ্যে যেতে হয়েছিল। এখানে বেশ কিছু তামাকের গুদাম ছিল।

কি ভাবে তামাক সেই গুদামগুলোয় রাখা হয়েছে দেখে আমাকে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

টিফিন ক্যারিয়ারে করে ভাত তরকারি নিয়ে গিয়েছিলাম। মধ্যাহ্ন ভোজনের অসুবিধা হবে না। এর সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দেওয়া কলা আর ডাব তো ছিলই। দুপুরে খাওয়া শেষ করে একটা বেতের চেয়ারে বসে রিপোর্টটা নোট করছি, হঠাৎ পিছনে কাতর কণ্ঠ, আটহয়া আটহয়া।

চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, সাইকেল হাতে শঙ্করণ দাঁড়িয়ে। কাগজের মতন মুখের রং দুটি চোখ বিস্ফারিত। খুব জোরে সাইকেল ছুটিয়ে আসার জন্য রীতিমত হাঁপাচ্ছে। ছুটে তার কাছে গেলাম, কি হয়েছে?

তাড়াতাড়ি আসুন, আপনার বন্ধু খুব অসুস্থ।

অসুস্থ? কি, জ্বর?

জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে দেখলাম শঙ্করণ নেই। খবরটা দিয়েই সাইকেলে রওনা হয়ে গিয়েছে। অগত্যা লোকদের বলে আমিও সাইকেল ছুটিয়ে দিলাম। যেতে যেতে মনে হল, শঙ্করণের যে রকম ভীতিবিহ্বল চেহারা দেখলাম, তাতে মনে হয় অসিত খুব গুরুতর অসুস্থ। অসিতের কোন মারাত্মক ধরণের অসুখ আছে, জানা ছিল না। বরং তাকে স্বাস্থ্যবান বলেই জানতাম। এখানে এসে ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ল নাকি। দূর থেকেই দেখতে পেলাম আমার বাড়ীর উঠানে লোকের ভীড়।

অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল। অসিতের খারাপ কিছু হল নাতো! আমি যেতেই একটা সম্মিলিত চাপা কলরব উঠল। একজন এসে আমার সাইকেলটা ধরল। উঠানের একপাশে একটা

ঘর পড়েছিল। ইঁটের দেয়াল, টালির ছাদ। শুনেছিলাম, অনেক আগে বাড়ীওয়ালা যখন এ বাড়ীতে থাকত, তখন ভদ্রলোকের গোটা দুয়েক গরু ছিল। ওটা গোয়ালঘর হিসাবেই ব্যবহৃত হত।

তারপর থেকে খালি পড়ে আছে। সেই গোয়ালঘরের সামনে জমাট ভীড়। আমাকে দেখে লোকেরা সরে যাবার রাস্তা করে দিল। একটু এগিয়ে উঁকি দিয়ে দেখেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। কোনরকমে পাশে দাঁড়ানো লোকটির ওপর ভর দিয়ে টাল সামলালাম। চোখের সামনে নারকীয় দৃশ্য।

মেঝের ওপর অসিত চিত হয়ে শুয়ে। অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় তার দুটি চোখ আতঙ্কগ্রস্ত, সারা শরীর কুঞ্চিত। ঠিক বুকের মাঝখানে সেই কালভৈরবী মূর্তি। মূর্তির চারপাশের অগ্নিশিখা কাঁকড়ার দাড়ার রূপ নিয়ে বুকের মাংস কুরে কুরে ফেলছে। লোকদের নিষেধ সত্বেও আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সবলে কালভৈরবীর মূর্তি টেনে তোলার চেষ্টা করলাম। সফল হলাম না। নিবিড় আকর্ষণে মূর্তিটা অসিতের দেহের ওপর চেপে বসেছে।

আমি আবার টেনে ফেলে দেবার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম কাছে। মূর্তি যেন পথ করে করে অসিতের দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হল।

সম্ভবত অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম দেখলাম সব শেষ। অসিতের দেহ নিস্পন্দ। দুটি চোখ বীভৎস ভাবে খোলা। দু'পাশ দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। কালভৈরবী মূর্তিটা কোথাও নেই। অসিতের বুকের ওপর যেখানে সেটা ছিল, সেখানে রক্ত কালো হয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে।

সমবেত লোকেরা হাততালি দিয়ে নাচগান শুরু করেছে। শঙ্করণের সাহায্যে নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। অসিতের বাড়ীতে টেলিগ্রাম পাঠালাম। দুর্ঘটনায় মৃত্যু। এ ছাড়া আর কি বলব। শঙ্করণ দারোগাকে এজাহার দেবার সময় ব্যাপারটা জানতে পারলাম। শঙ্করণ অসিতকে বোঝাতে গিয়েছিল। কালভৈরবী জাগ্রত দেবতা। এঁর অবমাননা করলে অসিতের সর্বনাশ হবে।

কথায় কথায় অসিত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। ছুটে গিয়ে কালভৈরবীর মূর্তিটা নিয়ে উঠানের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তাতেও বিরত না হয়ে লাথি মেরেছিল মূর্তিটাকে। সেটা ছিটকে গোয়ালঘরের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। অসিতও গোয়ালঘরে ঢুকেছিল। বোধহয় তার উদ্দেশ্য ছিল মূর্তিটা ভেঙে চুরমার করে দেবে। তারপরই হতভম্ব শঙ্করণ অসিতের আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। চোখের সামনে বীভৎস দৃশ্য দেখেছিল।

কি আশ্চর্য, দারোগা সব কথাই বিশ্বাস করেছিল। লিখে নিতে কোন দ্বিধা করে নি। দেবতার বিদ্বেষে এমন ঘটনা যেন খুব স্বাভাবিক। অসিতের শেষ কাজ করে বাড়ী ফিরতে ভোর হয়ে গেল। ক্লান্ত দেহ, বিষণ্ণ মন, চিন্তা করার ক্ষমতাও যেন লোপ পেয়েছে। তালা খুলে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই চমকে উঠলাম।

তাকের ওপর সেই কালভৈরবীর মূর্তি। বদ্ধ ঘরে কি করে এল মূর্তিটা! কে রাখল! অসিতের দেহের অভ্যন্তর থেকে এ মূর্তি বাইরে এল কি করে!

গোয়েন্দা ও প্রেতাত্মা

সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার নেমেছে। শহর নয়, শহরতলী। উঁচু-নিচু কাঁকর বিছানো রাস্তা। দু-পাশে আকন্দ, ফণিমনসা আর বনতুলসীর ঝোপ। এই সব গাছ-গাছড়ার জন্য জায়গাটা আরো অন্ধকার দেখাচ্ছে।

একটা জীর্ণ পাঁজরপ্রকট বাড়ি। বাড়ির আদি রং কি ছিল বলা মুশকিল। দু-একটা জানলা খুলে ঝুলে ঝুলে পড়েছে। কোন লোক বাস করে বলে মনে হয় না। আশেপাশে কোন বাড়ি নেই। বাঁজা মাঠ, মজা পুকুর, শেয়াল কুকুরের আস্তানা। সহসা অন্ধকার উদ্ভাসিত করে আলোর তির্যক রেখা দেখা গেল। মোটরের-হেডলাইট।

এ রাস্তায় মোটর মাঝে মাঝে যায়। গোবিন্দপুর যাবার এটাই সোজা পথ। সেখানে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে, তাই দলে দলে ব্যবসায়ীরা ছোটে। এ মোটরটা কিন্তু এই বাড়ির সামনেই থামল।

মোটর থেকে শার্ট-প্যান্ট পরা একটি যুবক নামল। হাতে সুটকেশ। টর্চ ফেলে রাস্তা দেখে দেখে বাড়রি মধ্যে ঢুকল।

লোকটি নামার পরই মোটর চলে গেল। যেদিক থেকে এসেছিল, সেই দিকে।

নিচের ঘরে মোমবাতির আলো জ্বলে উঠল। বোঝা গেল, লোকটি নিচের ঘরেই রয়েছে।

আধঘণ্টা—তার বেশি নয়। বিদ্যুৎবেগে একটা জীপ এসে থামল। জীপ থেকে একজন ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ নামল। পেছনে দুজন পুলিশ।

ইন্সপেক্টর জীপের মধ্যে উঁকি দিয়ে কাকে লক্ষ্য করে বলল কিহে এই বড়িটাই তো?

ভেতর থেকে উত্তর এল : আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।

ঠিক আছে, চল।

সামনে পিছনে দুজন পুলিশ, মাঝখানে ইন্সপেক্টর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা ঠেলবার আগে ইন্সপেক্টর কোমরের রিভলবার হাতে নিল। জীপ এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই মোমবাতির আলো নিভে গিয়েছিল। সমস্ত বাড়ি জুড়ে অন্ধকারের রাজত্ব।

প্রায় মিনিট পনেরো করাঘাতের পর ভেতর থেকে আওয়াজ এল : কে?

যাক, হুজুরের কপট নিদ্রা ভেঙেছে। দরজা খুলে গেল। যুবকটি দাঁড়িয়ে। হাতের বাতিদানে একটি বাতি। বাতির কোন দরকার ছিল না।—ইন্সপেক্টরের হাতের টর্চের আলোয় সব কিছু উদ্ভাসিত।

যুবকটির দুটি ভুর মাঝখানে বিরক্তির খাঁজ। রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করল, কাকে চাই?

ইন্সপেক্টর হাসল : পোশাক দেখেই তো বুঝতে পারছেন আমি পুলিশের লোক। এ বাড়ি আমরা সার্চ করব। কারণ, আমরা সন্দেহ করি নেপালের মধ্যে দিয়ে কিছু হাসিস আপনি আমদানি করেছেন, এবং একটু আগে সেসব এ বাড়িতে এসে পৌঁছেছে।

যুবকটি ঠোঁট মুচকে হাসল : এমন আজগুবি খবর কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন?

ইন্সপেক্টর এ ব্যঙ্গোক্তির কোন উত্তর দিল না। পুলিশদের দিকে ইশারা করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, বাতি জ্বালান। সুইচ কোথায়?

কথার সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো এদিক-ওদিক ফেলল। যুবকটির কণ্ঠে হাসির সুর : সুইচ থাকলে তো পাবেন! এ বাড়িতে আলো নেই। মোমবাতির ভরসা করে আছি।

সর্বনাশ, বাতিও নেই! নির্বান্ধব পুরীতে কি করে থাকেন মশাই?

শহরের হৈ চৈ একেবারে ভাল লাগে না। তাই মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে আসি।

সেজন্যে, না চোরা কারবারের সুবিধা বলে?

আপনাদের সঙ্গে তর্ক করে তো আর লাভ নেই। নিন, কি সার্চ করবার করুন। বাড়ি সার্চ করবার আগে আমাকে সার্চ করবেন না?

ইন্সপেক্টর আড়চোখে যুবকটির দিকে দেখল। ওর পরনে গেঞ্জি আর লুঙ্গি। এ পোশাকে কিছু লুকিয়ে রাখবে এ সম্ভাবনা কম। তবু ইন্সপেক্টর একজন পুলিশকে বলল, রামবিলাস, তুমি বাবুকে পাহারা দাও। আমি ঘরগুলো খুঁজে দেখি।

দুটি মাত্র ঘর। পেছনের বারান্দায় খাবার ব্যবস্থা। একটা ঘর একেবারে খালি। দু-একটা ভাঙা কাগজের বাক্স রয়েছে। এদিকের ঘরে তক্তাপোশের ওপর বিছানা। একটা আলনা।

ইন্সপেক্টর সব উল্টে-পাল্টে দেখল। এমন কি দেয়ালের গায়ে লাঠির ঠোক্কর দিয়ে দেখল, কোথাও ফাঁপা কিনা। বিছানাপত্র তছনছ করলে। পেছনের বারান্দায় টেবিলের ওপর কয়েকটা

পাঁউরুটি আর মাংস বাটি-চাপা দেওয়া। যুবকটি বোধ হয় খাবার আয়োজন করছিল। পুলিশ আসতে বাধা পড়েছে। ইন্সপেক্টর যুবকটির সামনে দাঁড়াল। বলল, কি করা হয়?

চাকরি করি।

চাকরি তো বুঝেছি। কিসের?

কিউরিও বোঝেন? আমি ইণ্ডিয়ান কিউরিও হাউসের প্রতিনিধি।

অফিসটা কোথায়?

সাত নম্বর ওয়েলফেয়ার স্ট্রীট।

ইন্সপেক্টর পকেট থেকে ছোট ডায়েরি বের করে ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বলল, এখানে আপনাকে খোঁজ করলে পাত্তা পাওয়া যাবে?

পাওয়া তো উচিত।

আপনার নাম?

অতনু গুপ্ত।

নাম কি একটাই?

মানে?

মানে, মহাপুরুষদের অনেক নাম থাকে কিনা!

মাফ করবেন, এখন আমি খুব ক্ষুধার্ত; আপনার রসিকতার তারিফ করতে পারছি না। আপনার কাজ হয়ে থাকলে যেতে পারেন—যাবার আগে ইন্সপেক্টর শেষবারের মতন টর্চের আলো এদিক-ওদিক ফেলল। না, সন্দেহজনক কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাস্তায় এসে ইন্সপেক্টর একজন পুলিশকে বলল, তুলসীচরণ, তোমাকে সারারাত এখানে পাহারা দিতে হবে।

সারারাত!

হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে, রাত্রে এ বাড়িতে কেউ আসবে। মালপত্তর হাতবদল করবে।

কেউ যদি মোটরে আসে, আমি একলা কি করতে পারি?

ইন্সপেক্টর অভয় দিল ঃ তুমি একলা নও, রাত বারোটা নাগাদ জীপে করে থানার ছোটবাবু আসবে। তার সঙ্গে পুলিশও থাকবে।

তুলসীচরণ ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করল। জীপ বেরিয়ে গেল। পরের দিন ছোটবাবু ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করল। ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করল, কি সেন, কি খবর?

ছোটবাবু মাথা নেড়ে বলল, না, কোন খবর নেই। সাড়ে আটটা বাজতেই বাতি নিভে গেল। ব্যস, সব চুপচাপ। মশার কামড়ে আমাদের প্রাণ যায়। সকাল আটটা পর্যন্ত ছিলাম। মনে হল, ভদ্রলোক তখনো ঘুমোচ্ছে। বেচারামকে পাহারায় রেখে চলে এলাম।

বাড়ির পেছন দিকে খোঁজ নিয়েছ?

হাঁ, নিয়েছি। সেদিকটা জঙ্গল। সেদিক দিয়ে কেউ গেছে বলে মনে হল না!

আশ্চর্য! অথচ যে লোকটা খবর দিয়েছে, সে মোটেই বাজে লোক নয়। এর আগে অনেক

দামী খবর দিয়েছে। আর এ কেসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বাড়িতে ঢুকে পড়লাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না।

বেলা বাড়তে ইন্সপেক্টর বেরিয়ে পড়ল।

ইণ্ডিয়ান কিউরিও হাউস। ইন্সপেক্টর দরজা ঠেলে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে গেল।

প্রৌঢ় পার্শী ভদ্রলোক পুলিশের লোক দেখে একটু শঙ্কিত হয়ে পড়ল : কি ব্যাপার?

আপনাদের এখানে অতনু গুপ্ত কাজ করেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুপ্ত আমাদের সেল্‌স্ রিপ্রেজেনটেটিভ। খুব কাজের ছেলে—

গুপ্ত থাকেন কোথায়?

শহরের বাইরে। মামুদপুরে। তবে গুপ্ত মাসের বেশির ভাগ দিনই বাইরে কাটায়। বিহার, ইউ পি, রাজস্থান।

কতদিন গুপ্ত আপনাদের এখানে কাজ করছেন?

প্রায় বছর চারেক।

তার আগে কোথায় ছিলেন?

তা জানি না। এত খোঁজ করছেন কেন বলুন তো?

ইন্সপেক্টর কোন উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে এল। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হিসেবে মিলছে না।

পথের মধ্যে ইন্সপেক্টর নেমে পড়ল। বরাত ভাল। বাইরের ঘরেই পারিজাত বক্সী বসেছিলেন। বিখ্যাত সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর ভাইপো। ইন্সপেক্টরকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বললেন, স্বাগতম। কি ব্যাপার, গরীবের কুটিরে? বড় বিপদে পড়ে এসেছি। তা জানি। সু-সময়ে কে আর আমার খোঁজ নেয়! বলো, কি করতে পারি?

ইন্সপেক্টর চেয়ার টেনে বসল। বলল, ব্যাপারটা এমন কিছু জটিল নয়। খুব সোজা কেস, কিন্তু তদন্ত করতে গিয়ে কোন কিনারা পাচ্ছি না।

ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে পারিজাত বক্সী মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। শেষে বললেন, যে খবর এনেছে সে খুব বিশ্বাসী?

আবদুল খবর এনেছে। তার খবর এ পর্যন্ত ভুল হয়নি। সে বলেছে, মারিজুয়ানা আর হাসিস আমদানী করে যে দল, সে দলে অতনু গুপ্ত আছে। এবং সেদিন সে সুটকেশে ভরে মাল নিয়ে ওই পোড়ো বাড়িতে উঠেছে, এ একেবারে ধ্রুব সত্য। অথচ সার্চ করে আমরা কিছুই পাই নি।

পারিজাত বক্সী প্রশ্ন করলেন অতনুবাবুর বাড়ির সামনে কোন পাহারা আছে?

হ্যাঁ, আছে। একজন কনস্টেবলকে মোতায়েন রেখেছি।

বাড়িটা ঠিক কোন্ জায়গায় আমাকে বুঝিয়ে দাও তো—

ইন্সপেক্টর নক্সা এঁকে বাড়ির অবস্থান বুঝিয়ে দিল।

পারিজাত বক্সী বললেন, ঠিক আছে, আমি একবার সরেজমিনে তদারকে যাব।

আমার থাকার দরকার আছে?

না, না, তোমার কনস্টেবল আমাকে ঠিক চিনবে। আমি ছদ্মবেশে যাব না।

ইন্সপেক্টর নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

পারিজাত বক্সী কাজের ভার নিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। অদ্ভুত বিচক্ষণ শক্তি, অনুধাবন ক্ষমতা, অপরাধতত্ত্বের সবকিছু নখদর্পণে। পুলিশকে বহুবার সাহায্য করেছেন। খোদ বড়কর্তা থেকে সাব ইন্সপেক্টর পর্যন্ত কৃতজ্ঞ। মনে হয়, কালে ব্যোমকেশ বক্সীর সমকক্ষ হওয়া বিচিত্র নয়।

পরের দিন সকালে পারিজাত বক্সী মামুদপুরে গিয়ে হাজির। মোটর একটু দূরে রেখে হাঁটতে হাঁটতে পোড়োবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। যে কনস্টেবল ডিউটিতে ছিল, সে এসে সেলাম করল। কি খবর, বাড়ির বাবু বের হন না?

হাঁ, সাব, বেলা সাড়ে ন'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়েন।

ফেরেন কখন?

অনেক রাতে।

উনি কোথায় যান খোঁজ রাখ?

ছোট দারোগাবাবু চৌরাস্তার পেট্রোলপাম্পে বসে থাকেন। বাবু ওখান থেকেই ট্যাক্সিতে ওঠেন। ছোট দারোগাবাবু জীপে করে তাকে অনুসরণ করেন। পার্ক স্ট্রীটের 'মনোলীনা' হোটেলে যান। সেখানে সাত নম্বর ঘর ওঁর নামে নেওয়া আছে। সারাদিন চুপচাপ হোটেলে নিজের রুমে বসে থাকেন। হোটেলেও আমাদের লোক পোস্টেড আছে।

পারিজাত বক্সী কিছু বললেন না। চিন্তা করতে লাগলেন, তাহলে লোকটা কিভাবে মাল পাচার করে? কোন ছিদ্রপথে? হোটেলের রুমটাও নিশ্চয় সার্চ করা হয়েছে। কথাবার্তার মধ্যেই অতনু বের হয়ে এল। পরনে সার্ট আর ফুল প্যান্ট। নিতান্ত সাধারণ চেহারা। কোন দিকে না চেয়ে হন্ হন্ করে রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করল।

তার আগেই পারিজাত বক্সী আর কনস্টেবল ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করল।

অতনু পথের বাঁকে মিলিয়ে যেতে পারিজাত বক্সী বললেন ঃ তাহলে রাত পর্যন্ত লোকটার তো ফেরার সম্ভাবনা নেই। আমি একটু বাড়ির মধ্যে যাব। যদি কোন কারণে লোকটি ফিরে আসে, আমাকে হুইসিল বাজিয়ে জানিয়ে দিও।

কনস্টেবল ঘাড় নাড়ল।

পারিজাত বক্সী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হলেন। তাঁর ধারণা ছিল, দরজায় খুব দামী তালা লাগানো থাকবে। কিন্তু না, একেবারে সাধারণ তালা।

পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে পারিজাত বক্সী দু মিনিটে তালা খুলে ফেললেন।

ভেতরে ঢুকে এদিক ওদিক দেখলেন। তক্তপোষের ওপর বিছানা গোটানো। বিছানা খুঁজলেন তন্নতন্ন করে। আলনার জামা-কাপড় নেড়েচেড়ে দেখলেন। দেয়ালে একটা ফটো টাঙানো। জাঁদরেল চেহারার এক ভদ্রলোক। পাকানো গোঁফ। মিলিটারি পোশাক। বোধ হয়, অতনু গুপ্তের পূর্বপুরুষদের কেউ হবে। পাশের ঘর একেবারে ফাঁকা। কোন জিনিসই নেই।

পারিজাত বক্সী কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। অতনু গুপ্তর এ বাড়িতে থাকার রহস্য কি তাহলে? অন্যলোকের হাতে 'মাল' কিভাবে কখন পাচার করল?

কোণের দিকে ছোট টেবিল। তাতে দুখানা বই। নিতান্ত কৌতূহলের বশে পারিজাত বক্সী বই-দুটো তুলে দেখলেন। একটা বই 'পরলোক রহস্য', অন্যটা 'মৃত্যুর পর।' এ ধরনের লোকদের এ জাতীয় বই আকৃষ্ট করে, এটাই আশ্চর্য। মনে হল, অতনু গুপ্তর পরলোকতত্ত্বের প্রতি ঝোঁক আছে। পারিজাত বক্সী বেরিয়ে এলেন।

এমন তো নয়, অতনু গুপ্ত 'মাল' আগেই সরিয়ে ফেলে, খালি সুটকেশ হাতে নিয়ে এখানে নেমেছে। স্রেফ পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য। ছোট সুটকেশটাই বা গেল কোথায়!

মনোলীনা হোটেল।

অতনু গুপ্ত বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, নিজের রুমের সামনে; পেছনে নারীকণ্ঠ শুনে ফিরে দেখল।

অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী। পরনে হালকা নীল শাড়ি, সেই রঙেরই ব্লাউজ। পাখির বাসার আকারে খোঁপা।

শুনছেন?

আমাকে বলছেন?

এখানে আর কে আছেন। আপনি তো এইমাত্র সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন, তাই না?

হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

আমার ঘড়িটা ব্যাণ্ড ছিঁড়ে পড়ে গেছে।

সিঁড়িতে?

তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন পাচ্ছি না।

আমি তো ঘড়ি-টড়ি দেখি নি।

কিছু মনে করবেন না। ঘড়িটা একজন আমাকে উপহার দিয়েছিল, এই ঘড়িটা হারিয়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। অতনু কি ভাবল, তারপর বলল, চলুন, আর একবার না হয় সিঁড়িটা খুঁজে আসি।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামল। ভাল করে খুঁজল। ম্যাটিং-র তলায়, রেলিংয়ের ফাঁকে। না, ঘড়ি কোথাও নেই। বয়, বেয়ারা থেকে শুরু করে নানা ধরনের লোক অনবরত ওঠা-নামা করছে, তাদের কেউ সরিয়ে ফেলেছে হয়তো।

তরুণীর মুখ বিষণ্ণ। অতনু বলল, পাওয়া গেল না।

তরুণী ম্লান হাসল, আমার অদৃষ্ট।

চা খাবার ঘণ্টা পড়ল।

অতনু বলল, চলুন, চা খেয়ে আসি।

তরুণী কিছু বলল না। অতনুকে অনুসরণ করল। চায়ের টেবিলে দুজনে মুখোমুখি বসল।

অতনু জিজ্ঞাসা করল, আপনি কত নম্বরে থাকেন?

দু নম্বর। আমি মাত্র কাল এসেছি। বাবা দিল্লী বদলি হয়ে গেলেন...আমি এখনে বি. টি. পড়ি। এ হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে বাবার অনেক দিনের আলাপ। তাই এখানে এসে উঠেছি।...আপনি?

আমি দিনের বেলা এ হোটেলে থাকি। এক কিউরিও প্রতিষ্ঠানের আমি প্রতিনিধি। এখান থেকে অনেকদূরে আমার বাড়ি। ক্রেতাদের পক্ষে অতদূরে যাওয়া সম্ভব নয়। তারা এই হোটেলে আমার কাছে আসে।

তরুণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ঃ কিউরিও? ওসবে আমার খুব আগ্রহ। দু-একটা দেখাবেন আমাকে?

নিশ্চয়। চা খেয়ে নিয়ে চলুন আমার রুমে। অতনু তরুণীকে নিয়ে নিজের রুমে এল।

টেবিলের ওপর ছোট্ট দুটো প্যাকেট। চেয়ারের ওপর তরুণী বসল। একটা প্যাকেট খুলে অতনু দেখাল। টেরাকোটার সাতটা ঘোড়া। একটি লোক লাগাম ধরে আছে।

অতনু বলল, উড়িষ্যার এক শিল্পীর তৈরি। কোনারকের অনুকরণে। সাতটি ঘোড়া সাতটি রশ্মির প্রতীক। চালক অরুণাদেব। খুব পুরনো জিনিস। মাটির তলা থেকে পাওয়া।

তরুণী মূর্তি নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে পর্যবেক্ষণ করল। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

তারপর অতনুর হাতে ফেরত দিয়ে বলল, চমৎকার জিনিস। এটার দাম কত?

অতনু হাসল ঃ কিউরিওর কোন নির্দিষ্ট দাম থাকে না। ক্রেতা হিসাবে এর দাম। আমেরিকান মহিলা পাকড়াতে পারলে, হাজার টাকা দাম হতে পারে।

হাজার টাকা একটা মূর্তিতে? তাহলে তো আপনি বড়লোক।

হাজার টাকা তো আর আমি পাই না। আমার কমিশন দশ পার্সেন্ট।

দ্বিতীয় প্যাকেট খোলা হল। নটরাজ মূর্তি।

তরুণী বলল, এ মূর্তি কিন্তু সাধারণ। খুব দেখা যায়।

অতনু মাথা নাড়ল। বলল, প্রথম দৃষ্টিতে এ মূর্তি সাধারণ বলে মনে হলেও, পায়ের ভঙ্গিটা দেখলে বুঝতে পারবেন, সচরাচর যে নটরাজ মূর্তি আমরা দেখতে পাই, তাতে পায়ের ভঙ্গি এরকম নয়। সেই জন্যই এ মূর্তির আলাদা একটা কদর আছে। এটি পাওয়া গেছে ম্যাঙ্গালোরের কাছে। এক চাষার লাঙলের মুখে। অনেকক্ষণ ধরে বিভিন্ন ধরণের মূর্তি নিয়ে দুজনে আলোচনা হল।

তরুণী বলল, মাঝে মাঝে এসে কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করব।

অতনু হাসল। বলল, বিরক্তির কি আছে। দুপুরবেলা তো আমি থাকি। যখন খুশি চলে আসবেন।

আপনার রুমটা বেশ ঠাণ্ডা...আমার রুমটার জানলা পশ্চিম দিকে বলে দুপুরের পর থেকেই গরম হয়ে ওঠে। পাখার হাওয়াও গরম। একেবারে পড়াশোনা করতে পারি না।

আপনি যখন প্রয়োজন মনে করবেন, এ ঘরে চলে আসবেন। আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে নেবেন।

তরুণী ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। অতনু জিজ্ঞাসা করল, আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না।

আমার নাম শিপ্রা নাগ। সেই শুরু। তারপর থেকে প্রতিটি দিন।

অতনু রোজই নতুন নতুন কিউরিও হোটেলে নিয়ে আসত। তারপর সাল, কুলুজি নির্ণয় চলত

শিপ্রার সঙ্গে। মাঝে মাঝে চাবি নিয়ে শিপ্রা এ রুমে চলে আসত। অতনুর অনুপস্থিতিতে। বই খাতা নিয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকত। একদিন অতনু বলল, চলুন, কোথাও বেড়িয়ে আসি।

কোথায়?

কাছাকাছি কোথাও, তারপর রাত্রে কোন হোটেলে ডিনার খেয়ে নেব।

সলজ্জ ভঙ্গিতে শিপ্রা নিমরাজি হল। দিন পনেরোর মধ্যে দুজনের মধ্যে মোহময় এক সম্পর্ক রচিত হল। খুব সকালে অতনু হোটেলে চলে আসত। বারান্দায় অতনু আর শিপ্রা পাশাপাশি বসত। চায়ের কাপ সামনে নিয়ে। দুপুরে অতনুর রুমে মজলিশ বসত দুজনের। প্রায়ই এই হোটেলে, কিংবা বাইরে কোথাও ডিনার খাওয়া চলত।

পনেরো দিন পর মনোলীনা হোটেলের সামনে পুলিশের জীপ এসে দাঁড়াল। জীপ থেকে একজন পুলিস ইন্সপেক্টরের সঙ্গে একটি মাঝবয়সী ভদ্রলোক নামল। পেছনে তিনজন পুলিশ।

দুজন পুলিশ অতনুর রুমের সামনে দাঁড়াল। মাঝবয়সী ভদ্রলোক আর পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রথমে দু নম্বর রুমে ঢুকল, তারপর বেরিয়ে অতনুর দরজায় করাঘাত করল। অতনু দরজা খুলেই পিছিয়ে গেল। বলল, কি ব্যাপার? পুলিশ ইন্সপেক্টর রুক্ষকণ্ঠে বলল, কি ব্যাপার, তাই জানতেই তো আপনার কাছে আসা।

তার মানে?

মানে, শিপ্রা দেবী কোথায়? মিষ্টার নাগের মেয়ে?

এবার মাঝবয়সী ভদ্রলোক বলল, শুনলাম, আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার খুব হৃদ্যতা ছিল। এখানকার বন্ধুরা দিল্লীতে আমাকে লিখেছিল। এখানে ওখানে দুজনকে একসঙ্গে দেখা যেত।

অতনু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে আলাপ ছিল। শিপ্রা বলেছিল, আপনি এলে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।

হুঁ, কিন্তু মেয়ে কোথায় আমার?

কাল দুপুরে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলেছিল, সন্ধ্যাবেলা এক প্রফেসরের কাছে যাবে। আমার সঙ্গে দেখা হবে না। আজ সকালে অনেকক্ষণ বারান্দায় অপেক্ষা করেছিলাম, শিপ্রা আসেনি। দু নম্বর রুমও দেখলাম তালা বন্ধ। ঠিক এই সময় একজন পুলিশ ভেতরে ঢুকল ঃ সাব, টেলিফোন! পুলিশ ইন্সপেক্টর দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল।

মিনিট দশেক পরে ইন্সপেক্টর যখন আবার অতনুর রুমে ঢুকল, তখন সে রীতিমত উত্তেজিত। মিঃ নাগের দিকে ফিরে বলল, মিষ্টার নাগ, বড় দুঃসংবাদ আছে।

দুঃসংবাদ?

হ্যাঁ, এই মাত্র লালপুর থানা থেকে খবর এল শিপ্রা নাগের মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

সে কি!

মিঃ নাগ চেয়ারের ওপর বসে পড়ল। সারা মুখে রক্ত নেই দুটি চোখ জলে ভেজা।

চলুন, আমরা এখনই বেরিয়ে পড়ি।

তারপর ইন্সপেক্টর অতনুর দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, মিষ্টার গুপ্ত, আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হলাম। যতক্ষণ না নিজের গতিবিধি সম্বন্ধে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবেন, ততক্ষণ আপনার মুক্তি নেই। দুজন পুলিশ অতনুর দুপাশে গিয়ে দাঁড়াল। সবাই জীপে উঠল।

শহরের বাইরে লালপুর থানা। সেখানে ইন্সপেক্টর কিছুক্ষণের জন্য নেমে গেল, তারপর এক পুলিশ সঙ্গে করে আবার উঠে এল। পচা ডোবার পাশে জরাজীর্ণ একতলা বাড়ি। সকলে নেমে গেল।

ইন্সপেক্টর জানলার ভাঙা খড়খড়ি দিয়ে দেখে নিয়ে বলল, আমাদের ভেতরে যাওয়া উচিত হবে না। ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্টের লোক আসবে। তাছাড়া ধুলোতে পায়ের দাগ থাকাও বিচিত্র নয়। সেগুলো মুছে যেতে পারে। সবাই খড়খড়ি দিয়ে দেখল। অতনুও। একটা কড়ি কাঠে দড়ি বাঁধা। শিপ্রা ঝুলছে। জিভ অনেকটা বেরিয়ে পড়েছে। দুটি চোখ বিস্ফারিত। ঠোঁটের দুপাশে রক্তের দাগ।

অতনুও চিৎকার করে উঠল : শিপ্রা।

ইন্সপেক্টর তীব্রকণ্ঠে বলল, খুব চমৎকার অভিনয় করতে পারেন তো? কিন্তু ওসব অভিনয়ে পুলিশের লোক ভোলে না। কাল হোটেল থেকে আপনারা দুজন বেরিয়েছেন, সে প্রমাণ আমাদের আছে। সন্ধান করে ট্যাক্সিওয়ালাকেও ধরেছি, সে স্বীকার করেছে আপনাদের লালপুর নিয়ে এসেছিল।...মিষ্টার নাগ, আপনার মেয়ের গায়ে গহনা ছিল না?

হ্যাঁ, জড়োয়ার হার, চুড়ি ছিল।

এটা আত্মহত্যা নয়, হত্যা। পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে সঠিক খবরই পাওয়া যাবে। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আপনার মেয়ের গায়ে কোন গহনা নেই। খুনের মোটিভ বোঝা গেল।

এবার অতনু রেগে উঠল : আপনারা মগের মুলুক পেয়েছেন নাকি? যা খুশি তাই করবেন!

ইন্সপেক্টরও গলার স্বর গম্ভীর করল : আপনার যা বক্তব্য কোর্টে বলবেন।

আমার উকিলের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

বেশ, থানায় গিয়ে উকিলকে ফোন করবেন।

অতনুকে থানায় নিয়ে আসা হল। সেখান থেকে অতনু উকিল ভবতোষ মজুমদারকে ফোন করল। উকিল নেই। খবর দেওয়া হল, এলেই যেন থানায় অতনুর সঙ্গে যোগাযোগ করে।

বিকালে পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট এল। আত্মহত্যা নয়, হত্যা। কেউ গলা টিপে শিপ্রাকে মেরে ফেলেছে, তারপর তার গলায় মোম-মাখানো দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্ট হাতের ছাপ তুলে নিয়েছে। পরের দিন সকালে তারা অতনুর হাতের ছাপ নিয়ে গিয়ে মেলাবে। সেই সময় অতনুর জুতোর ছাপও নেবে।

ইতিমধ্যে ভবতোষ মজমদার এসে দেখা করল। অনেকক্ষণ অতনুর সঙ্গে কথা হল। সঙ্গোপনে।

তারপর উকিল বলল, কত টাকার জামিন হলে ছাড়তে পারেন?

ও-সি মাথা নাড়ল : তিনশ দু ধারার কেস নন-বেইলেবল। জামিন চলে না।

আপনারা তো শুধু সন্দেহ করছেন।

খুনের কেসে প্রত্যক্ষ সাক্ষী খুব কমই থাকে। পরোক্ষ সাক্ষী অনেক আছে। তাছাড়া ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়বার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি তাহলে কোর্টে দরখাস্ত করব।

স্বচ্ছন্দে।

ভবতোষ মজুমদার বেরিয়ে গেল।

থানার পেছনে অন্ধকার এক ঘরে অতনুকে রাখা হল। খড়ের বিছানা। এককোণে জলের কুঁজো।

খাওয়া হয়ে যেতে অতনু দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। দূরে পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ। অতনুর চোখে ঘুম নেই। এ কি বিপদে সে পড়ল? মনে হচ্ছে তাকে ঘিরে বিরাট একটা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত করা হয়েছে। এ থেকে উদ্ধার পাওয়া মুশকিল।

হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ। অতনু চমকে মুখ ফেরালো, তারপরই মেরুদণ্ডে শীতল একটা শিহরণ অনুভব করল। কোণের দিকে দরজার কাছে শিপ্রা নাগ দাঁড়িয়ে।

একি, তুমি বেঁচে আছ?

শিপ্রা মাথা নেড়ে বলল, না, আমি বেঁচে নেই। আমার এক পুরোনো প্রেমিক ঈর্ষার বশে আমাকে হত্যা করেছে।

কিন্তু আমি যে জড়িয়ে পড়েছি।

জড়িয়ে পড়েছ কারণ তুমি মিথ্যাবাদী।

মিথ্যাবাদী!

নিশ্চয়। তুমি নেশার জিনিসের চোরাকারবারী, সে কথা আমার কাছে লুকিয়েছ।

অতনু ভ্রূ কুঞ্চিত করল : বাজে কথা।

বাজে কথা! আমি এখন যে-লোকে রয়েছি, সেখানে আমার অগোচর কিছু নেই—থাকতে পারে না। আমি জানি, তুমি মারিজুয়ানা, হাসিস আর কোকেনের এক বিরাট আন্তর্জাতিক চোরাকারবারী দলের সঙ্গে জড়িত। ঠিক কিনা বল?

অতনু কোন কথা বলল না।

বারবার শিপ্রা একই প্রশ্ন করল; কিন্তু অতনুর কাছ থেকে কোন উত্তর পেল না।

পর পর তিনদিন একই ব্যাপার।

ক'দিনেই অতনুর চেহারা অর্ধেক হয়ে গেল। চোখের কোলে কালি, নীরক্ত ঠোঁট। এরপর ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টও এসে গেল। শিপ্রার গলায় অতনুর হাতের ছাপ। ঘরের মেঝেয় জুতোর ছাপের সঙ্গে অতনুর জুতোর ছাপের কোন তফাৎ নেই। রিপোর্ট অতনুকে শোনানো হল।

বিস্ফারিত চোখে, বিবর্ণ মুখে অতনু সব শুনল। সে রাত্রে সে আহার্য স্পর্শ করল না। মাঝরাতে শিপ্রা এসে দাঁড়াল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, তোমাকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচানো আর সম্ভব নয়।

আর সম্ভব নয়?

কি করে সম্ভব হবে? আমি যা প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি তার উত্তর দিলে না—

কিন্তু একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক কী? তুমি তো ভালই জানো, আমি তোমার হত্যাকারী নই। তবে আমাকে বাঁচাবে না কেন?

বাঁচাব না, কারণ তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ।

এখন যদি আমি স্বীকার করি, তাহলে?

তাহলে হত্যার অপরাধ থেকে তোমাকে আমি বাঁচাব।

আর হাসিস নিয়ে কারবারের ব্যাপারে?

তুমি হাসিস কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বল, সেখান থেকে হাসিস আমি সরিয়ে ফেলব। কেউ তোমায় ধরতে পারবে না। কিন্তু তুমি যদি সবই জানো, তাহলে কোথায় হাসিস লুকিয়ে রেখেছি, তা তো তোমার অজানা থাকার কথা নয়—

শিপ্রা একটু দম নিল, তারপর বলল, কিছুটা বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত আমরা জানি। মামুদপুর আমার এলাকা নয়, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।

তুমি ঠিক আমাকে বাঁচাবে?

আমরা মিথ্যা বলি না।—শিপ্রার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ।

মামুদপুরে যে ফটো টাঙানো আছে, তার পেছনে হাসিস আছে।

সুটকেশ—সুটকেশ কোথায়?

ও সুটকেশ খোলা যায়। খুললে চাদরের মতন হয়ে যায়। প্রথম দিন আমি লুঙ্গির মধ্যে পরেছিলাম, ইন্সপেক্টর টের পায় নি; কারণ আমার বডি সার্চ করে নি। তারপর এক সময় কোটের মধ্যে করে মনোলীনা হোটেলে এনে রেখেছিলাম। পুলিশ আমার পেছনে লেগেছে বলে এতদিন হাসিস আমি পাচার করতে পারি নি। নাহলে মূর্তির মধ্যে করে খদ্দেরের হাতে চলে যেত।

শিপ্রা হাসল। বলল, অশেষ ধন্যবাদ।

পারিজাত বক্সীর বাইরের ঘরে ইন্সপেক্টর রায় বসেছিল। এদিকের সোফায় শিপ্রা নাগ।

পারিজাত বক্সী হাসলেন।

স্বীকার করি পদ্ধতিটা কিঞ্চিৎ গ্রাম্য হয়ে গেল। বিশেষ করে এই ফোরেনসিক যুগে। অতনুর ঘরে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে দু'খানা বই দেখে মতলবটা আমার মাথায় এসেছিল। শিপ্রা আমার শালী। ওর আসল নাম বিজয়া। শখের অভিনয়ে খুব নাম করেছে। ওকে কাজে লাগালাম। অতনুকে কাবু করতে ওর বিশেষ দেরি হল না। চোরাকারবারীই হোক, আর খুনীই হোক, এক জায়গায় সবাই দুর্বল। তারপর শিপ্রা ওকে প্রায়ই বলতো আমাদের মধ্যে যে আগে মারা যাবে, সে আরেকজনকে দেখা দেবে।

পরের ব্যাপারটা খুব শক্ত নয়। কৃষ্ণনগরের হেমন্ত পালকে দিয়ে শিপ্রার মূর্তি তৈরি হল। দেখেছ তো কি অদ্ভুত জীবন্ত মূর্তি। রক্তের দাগ মুখের চেহারা সব কি স্বাভাবিক। আলোছায়ার রহস্যের মধ্যে সে মূর্তি দেখে আমারই ভ্রম হচ্ছিল।

তাছাড়া, পোষ্টমর্টেম আর ফোরেনসিক রিপোর্ট সব জাল। কিন্তু তাতে খুব কাজ হল। অতনু গুপ্ত একেবারে ভেঙে পড়ল। আমার নিজেরও ধারণা হয়েছিল যে কিউরিও মারফৎ চোরাই জিনিষ এদিক ওদিক চালান দেওয়া হয়। তাই শিপ্রা ভাব করে অতনুর কাছ থেকে রুমের চাবি যোগাড় করেছিল।

অতনুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সবকিছু—তল্লাসী করেছে। মূর্তিগুলোও, কিন্তু কিছু পায় নি।

তারপর শিপ্রার প্রেতাত্মার আবির্ভাব। কয়েকদিন সুবিধা হল না, তারপর অতনু—ভেঙে পড়ল। তার স্বীকারোক্তি সবই টেপ—রেকর্ডে ধরা হয়েছে। কাজেই সেদিক দিয়ে কোন অসুবিধা হবে না।

ইন্সপেক্টর রায় জিজ্ঞাসা করল, হাসিস?

মামুদপুরে অতনুর ঘরে মিলিটারি পোশাকে যে ফটোটা ছিল, সেটা আমরা ভেবেছিলাম অতনুর পূর্ব পুরুষের ছবি, তার মধ্যেই সব পাওয়া গেছে। ছবিটা ফাঁপা। ছবির পোষাকের মধ্যে বেশ ফাঁক, সেখানে হসিস সাজানো। পিজবোর্ড ভাঙতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

পারিজাত বক্সী দাঁড়িয়ে উঠলেন। হেসে বললেন, এবার আমার কাজ শেষ।

তোমাদের কাজের শুরু। দেখ, যদি জেরার মুখে অতনু অন্য সঙ্গীদের নাম করে। তবে সে সম্ভাবনা কম।